তেইশ
বছর
আগে
পরে

মা নি ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা-১৪

প্রকাশক মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
৫১, বেনিয়াপুকুর রোড, কলি-১৪
মুদ্রাকর প্রফুল্লপ্রকাশ ঘোষ
ভাগ্যলক্ষ্মী প্রেস ২০৭, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট

প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৩৬০
॥ দাম সাড়ে তিন টাকা ।
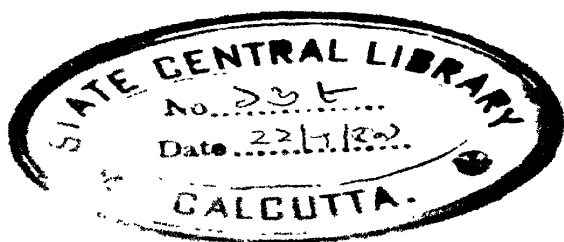
প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী
প্রচ্ছদ মুদ্রন নিউ প্রাইমা প্রেস
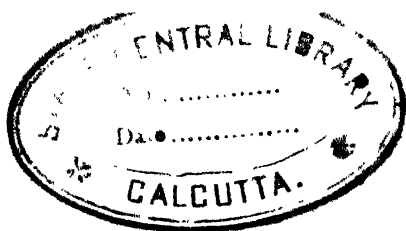
তেইশ বছর আগে পরে

প্রথম অধ্যায়

তেইশ বছর আগে ছাত্রজীবনে একটি করুণ কাহিনী রচনা করেছিলাম। 'অতসী মামী' নিয়ে গল্প লেখা সুরু করার পর এটি আমার দ্বিতীয় লেখা। কাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রায়। সম্পাদকেরা নতুন লেখকের রসালো গল্পও স্বেচ্ছায় খুসী হয়ে ছাপেন বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে এটা প্রমাণ করার জন্য লেখা 'অতসী মামী' বার হবার পর বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেনদা'র তাগিদ আর উৎসাহেই দু'নম্বর কাহিনীটি লেখা হয়। 'অতসীমামী'ও করুণ রসে ফেণানো কাহিনী। পরে এই কাহিনীটির নাম দিয়ে গল্প-সঙ্কলন বার করতে আমার দ্বিধা হয় নি। কারণ, রস যাই থাক, যতই রোমান্টিক হোক, ওটা ছিল সম্পূর্ণ গল্প। ওই কাহিনী-সঙ্কলনের মধ্যে 'অতসীমামী'র পরেই 'ব্যথার পূজা'কে ঠাঁই দেবার লোভ সামলাতে নিজের সঙ্গে কি লড়াইটাই করতে হয়েছিল অনভিজ্ঞ তরুণ লেখক আমাকে! এতো গল্প নয়। এ যে অসম্পূর্ণ কাহিনী। মাসিকের পাতায় জীবনের খণ্ডিত একপেশে অসম্পূর্ণ কাহিনী ছাপানোর ছেলেমানুষির জের তো গল্প-সঙ্কলনে টানা চলে না!

কাহিনীটিকে সম্পূর্ণতা দেবার দায়িত্বই কেবল নয়, বাস্তবকে ফাঁকি দিয়ে আর সত্যকে আড়ালে রেখে কি ভাবে ফেণিল ভাবালুতার গল্প লেখা যায় সেটা দেখিয়ে দিয়ে সাহিত্যে 'ব্যথার পূজা'র নজির বাতিল করার দায়িত্বও আজ তেইশ বছর পরে পালন করছি।

ছু'একটি সামান্য ভুল ত্রুটি সংশোধন করে বিচিত্রায় প্রকাশিত অসম্পূর্ণ কাহিনীটি অবিকল তুলে দিয়ে আমাদের উপন্যাস আরম্ভ করা যাক ঃ

১

বন্ধুর জীবনের কাহিনী।

যে বয়সে যৌবন বিদায় নেয় না সেই বয়সে বন্ধু পৃথিবী হ'তে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। তার ব্যথার পূজা সমাপ্ত হয়েছে কি হয়নি সে প্রশ্নের জবাব আজ আর মিলবে না। জীবনের ওপারে, যেখানে দুঃখলেশহীন অফুরন্ত আনন্দ উৎসবের অপরিম্লান হাসিই শুধু ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে শুনতে পাই, সেখানে গিয়ে যদি তার দেখা পাই, তবে হয়ত এ প্রশ্নের জবাব পাব।

এক একটি অভিশপ্ত জীবনে এক একটি বিশিষ্টক্ষণে মরণের প্রলোভন কি দুর্জ্জয় হ'য়েই না দেখা দেয়। বেদনায় বিকল প্রাণ দেহের বন্ধন কাটিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

জীবন হয় রসহীন, তিক্ত ; মরণ হয় মধুর। বন্ধুর জীবনে তেমনি একটি ক্ষণ এসেছিল। কিন্তু ইহজগতে থেকেই দিনের পর দিন স্তূপীকৃত হ'য়ে ওঠা বেদনার আগুনে নিজেকে শুদ্ধ করবার আশায় মৃত্যুর সেই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা সে জয় করেছিল। এ পারের ব্যর্থ সাধনায় ওপারের জীবনকে সার্থক ক'রে তুলবার জন্য সে বেঁচেছিল ব'লেই আজ এই কল্পনাতীত বেদনার্ত্ত কাহিনী বলবার সুযোগ আমি পেয়েছি ; না হ'লে কোথায় কবে এক দীর্ণ আত্মা অস্বাভাবিক উপায়ে স্বাভাবিককে বরণ ক'রে নিত, নিখিল অন্তরে যার আনাগোনা তিনি ছাড়া এতটুকু আভাসও হয়ত কেউ পেত না।

তার তপস্যার, তার সুতীব্র সাধনার সমাপ্তি হ'য়ে গেছে। গেছে যাক্। চোখে আমার জল আসে আসুক। বিরাম নেই, বিচ্যুতি নেই, ক্ষণিকের বিস্মৃতি নেই, সুদীর্ঘ তেরো বছরের প্রত্যেকটি অনুপল সে জ্বলেছে। অতল বিস্মৃতির অন্ধকারে তার বেদনা ঢাকা পড়ুক, স্বপ্নহীন চিরনিদ্রার কোলে তার দীর্ণ হৃদয় অনন্তকাল ঘুমিয়ে থাকুক। তার কথা ভেবে চোখের জল ফেলি, কিন্তু এ ছাড়া আমার অন্য কামনা সে বেঁচে থাকতেও ছিল না।

উচ্ছ্বাস থাক, ভাল লাগে না। বেদনার সমুদ্রের পরিচয় দিতে খানিকটা ফেনা তুলে দেখিয়ে লাভ নেই, লজ্জাও করে।

নাম জগদীশ—। ঢাকা সহরে আমাদের ছিল পাশাপাশি বাড়ী। কবে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছিল, ভুলে

গেছি। তার বাবা ছিলেন টাকার কুমীর না কি বলে তাই। তাদের রাজপ্রাসাদের পাশে আমাদের বাড়ীটা নিতান্ত খাপছাড়া দেখাত নিশ্চয়, কিন্তু কেন যে এই বাড়ীটা জগদীশের ভাল লেগেছিল সেই জানে। জন্মেই মাকে হারিয়েছিল, আমার মার কাছেই তার দিন এবং রাত্রির বেশীর ভাগ সময় কাটত। বাবা তার ছিলেন ভারি ভাল মানুষ। টাকার গদীতে ব'সেও যারা তুলোর গদী ছাড়া বসবার জন্য কিছু পায় না তাদের ছোট মনে করতেন না। জগদীশ যে আমার সঙ্গে মিশত তাতে তাঁকে খুসী হ'তেই দেখেছি।

তেইশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব জমাট বাঁধল, তারপর হ'ল ছাড়াছাড়ি। এক সঙ্গে এম, এ পাশ ক'রে আমি চাকরি নিলাম এবং একটি ছোট্ট মেয়ের জীবনের সঙ্গে বাকী জীবনটা গেঁথে ফেল্লাম। জগদীশ সে সব কিছু করল না, বাপের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে মস্ত জাহাজে চেপে বসল।

মনে পড়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কি পড়তে যাচ্ছিস রে?

ছোঃ! পড়তে নয়, বেড়াতে। যাবি?

বিয়ে করে ফেল্লাম যে!

ওই তো দোষ! করলি কেন? বৌদি অভিশাপ দেবে তাই, নইলে তোকে কি ফেলে যেতাম রে!

পূর্ব্ব হ'তেই স্থির ছিল বিদায়ের সময় কেউ মুখভার করতে পারব না। হাসি মুখেই কথা বলছিল, কিন্তু যখন আমার নেমে আসার সময় হ'ল চকিতে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে তেইশ বছরের বন্ধু আমার কাঁদল!
যাবার সময় কাঁদল কিন্তু তু'বছরে চিঠি লিখল মোটে তিনখানা!
জগদীশকে চিনতাম, চিঠিপত্র লেখা তার ধাতসই নয়।
জগদীশের বাবা ডেকে পাঠালেন।
চিঠিপত্র পাও?
আজ্ঞে না। জানেন তো চিঠি লিখতে ওর কত আলস্য।
ভাবনা হচ্ছে যে হে! যে ছেলে!
বল্লাম, আজ্ঞে, এমনিই তো চিঠি পত্র লেখে না, তার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!
একটা টেলিগ্রাম করব কিনা ভাবছি। কোথায় আছে তাও কি ঠিক জানি ছাই! চরকির মত ঘুরছেই তো খালি।
বৃদ্ধ একটা নিশ্বাস ফেললেন।
বছর চারেক পরে জগদীশ দেশে ফিরল। ফিরবার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না, বাপের কঠিন অসুখের খবর পেয়ে বাধ্য হয়েছে ফিরতে।
তার আসার দিন পাঁচেক আগেই তার বাবা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধের পর মাস তিনেক বাড়ী থেকে কলকাতায় চ'লে গেল।
তারপর দশ বছর আর সাড়া শব্দ নেই। মাঝখানে কেবল খবর শুনলাম, সে তার সর্ব্বস্ব দান করেছে। অদ্ভুত দান! বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল সব বিক্রি ক'রে একটা ফাণ্ড করে দিয়েছে বাংলা থেকে প্রতি বৎসর তুটি মেয়েকে মিউজিক শিখবার জন্য বিলাতে পাঠাতে। যে বছর বাঙ্গালী মেয়ে পাওয়া

যাবে না সে বছর ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের মেয়েরা ওই বৃত্তি পেতে পারবে।

কিছুকাল পরে রাঁচি থেকে একটি পোষ্টকার্ড বন্ধুর বার্ত্তা বহন ক'রে আনল। জরুরী দরকার কিছু টাকা চেয়েছে।

কিছুই মাথায় ঢুকল না। রাঁচি সহর নয়, চিঠি লিখেছে একটা কটমটে নামযুক্ত গ্রাম থেকে। রাঁচির অভ্যন্তরে এক বিকট নামের এবং খুব সম্ভব নামের চেয়েও বিকটতর গ্রামে আমার বাল্যবন্ধুটি কি করছে, এতকাল পরে জরুরী প্রয়োজন জানিয়ে সামান্য কটা টাকা বা চেয়ে পাঠাল কেন অনেক ভেবেও প্রশ্ন দুটির জবাব পেলাম না।

সর্ব্বস্ব দান করার খবরটা যদি সত্যও হয়, বাপের রাশি রাশি টাকা থেকে নিজের দরকার মেটাবার মত টাকাও কি সে রাখে নি ?

সেইদিন রাত্রের একস্প্রেসে রওনা হ'লাম। রাঁচিতে এক বন্ধু থাকতেন, তিনিই খবর নিয়ে জানালেন গ্রামটি হুড্রুফলস্ যেতে মোটরের শেষ ষ্টপেজ। এই গ্রামের পর মাইল দেড়েক হেঁটে ফল্স্-এ যেতে হয়।

তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি নিয়ে বার হলাম। ষোল মাইল ভাল এবং মাইল আষ্টেক খারাপ রাস্তা পার হ'য়ে গন্তব্য স্থানে যখন পৌঁছলাম তখন চারটে বাজে। শীতের বেলা, এরি মধ্যে রোদের তেজ কমে গেছে।

যেখানে মোটর থামল তার হাত কয়েক দূরে খড়ের ছাওয়া কতগুলি মাটির ঘর। মোটরের শব্দে কোমরে তিনহাত চটের মত মোটা কাপড় জড়ান জন পাঁচেক লোক ছুটে এল। নিজের একান্ত আধুনিকত্ব নিয়ে প্রকৃতির একেবারে অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করে মোটরটি বোধ হয় লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, ড্রাইভারের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র নিঃশব্দ হ'য়ে গেল। আমার মনে হ'ল যে সভ্যতা ও আধুনিকতা চব্বিশ মাইল পিছনে ফেলে এসেছি তারই একটা অস্ফুট আওয়াজ কানে আসছিল, হঠাৎ সেটিও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ও তো গেল কবিত্বের দিক। জগদীশ কি সত্যি এইখানে বাসা বেঁধেছে? ঠাট্টা করে নি তো? দশবছরের নীরবতার পর এমনি একটা পরিহাস করবে সেটাই বা কেমন কথা!

একটি লোককে কাছে ডেকে প্রশ্ন করলাম, এখানে এক বাঙ্গালীবাবু আছে রে?

বংগালী বাবা? হঁ!

বাবু নয়, বাবা! সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে নাকি?

কোথায় থাকেন? ঘর চিনিস্?

কুটিরগুলির পিছনে আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে লোকটা সঙ্কেত করল।

তাকেই সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলাম। আনাচ কানাচ দিয়ে খানপাঁচেক ঘর পার হয়ে দেখা গেল অন্য কুটির থেকে একটু তফাতে একখানা ঘর দাঁড়িয়ে আছে। সামনে গিয়ে ডাকলাম, জগদীশ?

জগদীশ ভেতরে ছিল, বাইরে এসে চমকে উঠল। এত দূরে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি একথা যেন কোনমতে সে বিশ্বাস করতে পারছে না এমনি ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জগদীশই বটে। মানুষ বদলায়, তার নাম বদলায় না, নইলে জগদীশ ব'লে এর পরিচয় দিতে বাধত। চার বছর য়ুরোপ বাসের পর দামী বিলাতী পোষাক পরা যে লোকটি ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে সিগারেট চেপে ধ'রে অন্য কোণে সাহেবী হাসি ফুটিয়ে সজোরে আমার হাত ধরে নাড়া দিয়ে প্রীতি জানিয়েছিল, সে যদি জগদীশ, এই ময়লা চটে কোমর থেকে হাঁটু অবধি ঢেকে, খালি গায়ে খালি পায়ে, একমাথা রুক্ষ চুল আর জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ দেহ নিয়ে যে লোকটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল তাকে জগদীশ বলব কোনমুখে?

নীচে নেমে এসে আমার দুটি হাত চেপে ধ'রে বলল, স্বপ্নেও ভাবিনি তুই আসবি ভাই! এখনো যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ভেতরে আয়।

সে না হয় যাচ্ছি, কিন্তু এ কি কাণ্ড বল্ তো? এখানে কি করছিস? এমন চেহারা হয়েছে কেন? কতদিন আছিস এখানে?

ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়ে বল্লে, সব বলব, ভেতরে আয়। পাতার কুটিরের প্রাসাদে চাটাইয়ের সিংহাসনে বসিয়ে আজ তোর অভ্যর্থনা করব। এত দিনে আমায় ভুলিসনি! এত দূরে ছুটে এসেছিস বন্ধুকে দেখতে!

হাত ধ'রে ভেতরে নিয়ে গেল। ছোট ঘর, হাত দশেক লম্বা, হাত আষ্টেক চওড়া। এককোণে কয়েকটা হাঁড়ি কলসী। একপাশে উনুন, তার কাছে মাটির বেদীর ওপর কালিমাখা গুটি দুই হাঁড়ি। একদিকে খাবার জলের কলসীর কাছে একটা এল্যুমিনমের গেলাস ছাড়া সমস্ত ঘরে ধাতব বাসন আর চোখে পড়ল না। অন্য পাশে খড়ের গদীতে চাটাই বিছানো,— জগদীশের রাজ-শয্যা! বালিশ নেই, বাড়তি এবং ছেঁড়া কাপড় মাথার কাছে পুঁটলি করা আছে।

এম্‌নি সব আসবাবের মাঝে নিতান্ত খাপছাড়া একটি অপূর্ব্ব আসবাব চোখে পড়ল। বিছানার পাশে, সিল্কের রুমাল ঢাকা দামী মেহগনি কাঠের ছোট্ট একটি জলচৌকী। তার ওপরে একটি চওড়া পাড় শাড়ী। শাড়ীটির জায়গায় জায়গায় লালচে দাগ, বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

ওটা কি রে?

যেন নিতান্ত বিস্মিত হয়েছে এমনিভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে ব্যথিত স্বরে জগদীশ বল্লে, অমন ক'রে বলছিস যে? বুঝতে পারছিস না? আমার স্ত্রীর কাপড়।

স্ত্রীর কাপড়! জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইলাম। স্বপ্নের জড়তা কাটাতে মানুষ যেমন নিজের মাথায় ঝাঁকুনি দেয় তেমনি ভাবে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে জগদীশ যেন নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিল। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, তুই যে জানিস না খেয়াল ছিল না ভাই। সব বলব, তখন বুঝবি। তোর কাছে পয়সা আছে?

ব্যাগটা বার ক'রে তার হাতে দিলাম। একটা সিকি বার করে জগদীশ ডাকল, জিরাই।

দরজার কাছে পাঁচ সাতজন লোক বসেছিল, একজন সাড়া দিল, আজ্ঞে বাবা?

কিছু দুধ আর কলা যোগাড় করে নিয়ে আসতে হবে যে বাবা!

আমি হাঁ ক'রে জগদীশের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এ কী কণ্ঠস্বর! এ কী বলবার ভঙ্গি! ঠিক যেন প্রবীণা গৃহিণী। পরের ছেলেকে কাজে পাঠাবার সময় এমনি অনুকরণীয় কণ্ঠে তারাই অনুরোধ জানান বটে! সংসারের ছোট বড় ঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠে যারা, অথচ যাদের জীবনের সমস্তটুকুই নিহিত আছে ওই ঝঞ্ঝাট ভোগ করার মাঝে, তাদেরই শান্তি আর ক্লান্তির ছায়াপাতে অপূর্ব্ব মুখচ্ছবির এ কি অবিকল প্রতিলিপি আমার এই বাল্যবন্ধুটির মুখে ফুটে উঠল!

ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলছিল, দুধ কলা আর মোটা চিড়ার ফলার অমৃতের মত লাগল। বাইরে ছোট্ বারান্দার মত ছিল, জলযোগের পর সেইখানে গিয়ে বসলাম। তারপর দুজনের যে সাধারণ খবরাখবর আদান প্রদান এবং সুখ দুঃখের গল্প চলল তার সঙ্গে এ কাহিনীর সম্বন্ধ নেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শীতের সন্ধ্যা, তবু আমার মনে হল এ সন্ধ্যারও যেন একটা নিজস্ব মাধুর্য্য আছে। আর

সেই মাধুর্য্যের খোঁজ মেলে এমনি এক নির্জ্জন, নিঃশব্দ, সভ্যতার বাঁধন খসানো অখ্যাতনামা গ্রামে পাতার কুটিরে ছেলেবেলার বন্ধুর পাশে বসে। যতদূর দৃষ্টি চলে,—অনন্ত বৃক্ষশ্রেণী। সবুজ আর সবুজ। সেই সবুজ গাঢ় হ'তে হ'তে সবুজের সীমা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে কালো হয়ে ওঠে।

জগদীশ হঠাৎ বলে, সহরে ফিরে যাবি ত?

এই চব্বিশ মাইল ফিরে যাব?

কিন্তু এখানে কি রাত কাটাতে পারবি ভাই, ভারি কষ্ট হবে?

বল্লাম, তুই যদি এতকাল এখানে কাটাতে পেরে থাকিস, একটা রাত কাটাবার ক্ষমতা আমার হবে।

জগদীশ একটু ভেবে বল্লে, আমায় কিন্তু জিরাই-এর মেয়ে রেঁধে দিয়ে যায়, খাবি তো?

তুই খাস, আমি খাব না?

জগদীশের সঙ্কোচ তবু গেল না, ইতস্ততঃ করে বল্লে, বিছানা নেই, কিছু নেই—

বাধা দিয়ে বললাম, নেই তো নেই! এই চাটাইয়ে পাশাপাশি শুয়ে দুই বন্ধুতে গল্প করেই রাত কাটিয়ে দেব।

খানিক পরে জিরাই-এর মেয়ে হাজির হ'ল। আঁট সাঁট গড়ন, বিধাতা গায়ের রঙের দোষ পুষিয়েছেন অতিরিক্ত যৌবন দিয়ে। সরমকুণ্ঠিত পদে জল আনতে চলে গেল। জল এনে মসলা বেটে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে অস্ফুটস্বরে কি বলল, বুঝতেই পারলাম না।

জগদীশ বল্লে, আচ্ছা যা। মাছ পাস্ তো আনিস।

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

জগদীশ বল্লে, আমি হলাম জিরাই-এর বাবা, সেই সূত্রে ওর দাদামশাই। তোকে দেখে আজ মুখ খুললো না অন্যদিন কত গল্পই করে। স্বামীটা পাঁড় মাতাল, দিন রাত তাড়ি গেলে আব ওকে ধরে মারে। কিন্তু মেয়েটা সেই মাতালটাকেই যে কি ভালবাসে ভাবলে অবাক হয়ে যাই। জাত অজাত মানে না, ভদ্র অভদ্র জানে না, মার্জ্জিত অমার্জ্জিত মনের খবর রাখে না, ভালবাসা বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাই ভাবি। অমন চেহারা, মাতালটাকে ছেড়ে যে-কোন ভাল লেকাকে বিয়ে করতে পারে, ওদের সমাজে তাতে দোষ নেই। সবাই উপদেশও দেয় তাই। ও শুনে ঘাড় নেড়ে বলে, করব। কিন্তু করে না। আমি একবার বলেছিলাম, জবাব দিয়েছিল, কি করব ভাইয়া, ওকে ছাড়তে মন কাঁদে! আশ্চর্য্য!—জগদীশ একটা নিশ্বাস ফেল্‌ল।

এখানে কেন সে এভাবে আছে এ প্রশ্নের জবাবে সে বলল, আজ নয় ভাই, কাল সকালে বলব—দিনের বেলা।

চাটাইয়ে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে! জলচৌকীটির সামনে হাঁটু গেড়ে নিস্পন্দ হয়ে জগদীশ বসে আছে। তার সমস্ত মুখ আমার নজরে পড়ছে না, যেটুকু পড়ল তাতে আমার বুকের ভেতর টন টন করে

উঠল। একবার জগদীশের সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নত করে সে শাড়ীটিকে চুম্বন করল। সে কি চুম্বন! মনে হল শাড়ীটির ভাঁজে ভাঁজে, প্রত্যেকটি সূতার পাকে পাকে সুধা সঞ্চিত হয়ে আছে, অধরের স্পর্শ দিয়ে অনন্তকাল জগদীশ সে সুধা পান করে যাবে। কতক্ষণ পরে হিসাব ছিল না, জগদীশ মাথা তুলল। মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইতেই দেখলাম তার দুচোখ জলে ভরে গেছে। তাড়াতাড়ি চোখ বুজে নিঃশব্দে পড়ে রইলাম। তার বুক ভাঙ্গা দুঃখের এমন অপূর্ব্ব প্রকাশের সাক্ষী হ'য়ে যে রইলাম, সে কথা গোপনই থাক।

নিজে থেকে যদি বলে, শুনব। যার যা বেদনার সম্পদ সে তার গোপন থাকাই শ্রেয়।

পরদিন অতি ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জীবনের এতগুলি বছর কাটিয়ে দেবার পর সেই দিন প্রথম অনুভব করলাম পাখীর ডাকে ঘুমভাঙ্গা জিনিষটা সত্যি সত্যি কী। কিচির মিচির প্রলাপ, কিন্তু কি মিষ্টি! যেন প্রভাতকে বরণ করে নেবার বরণডালায় লক্ষ প্রাণীর প্রকাশব্যাকুল আনন্দ-প্রদীপের শব্দিত শিখা!

ড্রাইভার এসে সেলাম জানিয়ে বল্লে, কখন ফিরবেন বাবু? বাহুল্য প্রশ্ন। আসল কথা, ভাল রকম সেলামীর ব্যবস্থা না করলে সে আর এই জঙ্গলে পড়ে থাকতে রাজী নয়। তাই করা গেল।

বেলা বাড়ল। জগদীশকে বললাম, ফলস্‌ দেখে আসি চল্‌।

জগদীশ ঘাড় নেড়ে বল্লে, এখন নয়, বিকেলে।

প্রায় তিনটের সময় জগদীশ আমাকে ফলস্‌ দেখাতে নিয়ে চলল। উঁচু নীচু বাঁকা পথ। কোথাও সর্ষে ক্ষেতের বুক ভেদ ক'রে গেছে, কোথাও ছোট বড় পাথরের টুকরো দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে। অর্দ্ধেক পথে ছোট একটি নদী পড়ল। আসলে ঝরণাই ; এরা বলে নদী। হেঁটেই পার হওয়া যায়। গোটা পনের মহিষ স্নান করছিল, সেই মহিষবাহিনীর সেনাপতিকে দেখে আমি হেসে ফেল্লাম। বছর পাঁচেকের একটা উলঙ্গ ছেলে সকলের বড় মহিষটার পিঠে গদীয়ান হয়ে তারস্বরে আদেশ জারি করছে। এই ধুম্‌সো কালো দৈত্য-গুলিকে আগলাবার ভার পড়েছে এই পুঁচকে মানবসন্তানটির ওপরে! হাসির কথাই!

জলপ্রপাতের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি কানে আসতে বুঝতে পারলাম, কাছে এসেছি। আরও কিছু দূর অগ্রসর হতে শব্দ বাড়ল এবং দেখা গেল পাথরে ঠাসা নদীগর্ভে জলস্রোত বয়ে চলেছে। শীতকাল, জল বেশী নেই।

জগদীশ আঙুল বাড়িয়ে বল্লে, ওই পাথরের ওপাশে চল। সেখানে চারশো ফিট নীচে এই জলের ধারা আছড়ে পড়ছে। পাথরে পাথরে পা দিয়ে প্রপাতের মুখের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

নর্ম্মদার বিপুল জলরাশির বিপুলতম পতনের সৌন্দর্য্য দেখে এসেছি। আজ বুঝলাম বিপুলতাই সব নয়, সৌন্দর্য্য ক্ষুদ্র বৃহতের অপেক্ষা রাখে না। নর্ম্মদা সুন্দর, কিন্তু এই যে গুচ্ছ গুচ্ছ সৌন্দর্য্যের ফুল ফুটে আছে এখানে শ্যামসুন্দর রূপ তরুর শাখায়, এরও তো তুলনা বোধ হয় নেই!

চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হ'ল, ওস্তাদ শিল্পী বটে! এ যেন ছবির মাঝে চঞ্চল জীবনের প্রকাশ। পাথর নড়ে না, পাহাড় নড়ে না, চতুর্দ্দিকের তরুশ্রেণীর শাখায় বাতাসের বেগে যে দোলা জাগে তাও চোখে ধরা পাড়ে না, সব যেন তুলি দিয়ে আঁকা নিশ্চল ছবি। তার মাঝে এই পাহাড়ী ঝরণা জীবন্ত, এর প্রাণ আছে, এ চঞ্চল। প্রতি মুহূর্ত্তে বিরামহীন গতিতে চারশো ফিট নীচে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে চূর্ণ করে শুভ্র কুহেলির জাল বুনে সূর্য্যকিরণের রশ্মি-বিশ্লেষণে অপূর্ব্ব শোভা ফুটিয়ে তুলছে!

পাশ দিয়ে ঘুরে নীচে নামলাম। নীচে থেকে সবটুকু জলধারা দৃষ্টিগোচর হয়। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। সূক্ষ্ম জলকণা ঝরণার প্রীতিস্পর্শ জানিয়ে দিল। ওপরে যখন উঠলাম তখন চারটে বেজে গেছে এবং হাঁফ ধরে গেছে।

একপাশে প্রকাণ্ড একটি মসৃণ পাথর পড়েছিল। দেখলেই বোঝা যায় মানুষের হাত করেছে। বললাম, আয়, এই পাথরটাতে বসি।

অগ্রসর হ'তেই জগদীশ আমার হাত চেপে ধ'রে বল্লে, না।

চেয়ে দেখি তার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে। হাত ধরে সেই পাথরের পাশে অন্য একটা পাথরে বসিয়ে বল্লে, বলছি।

সেইখানে প্রপাতের একটানা ছন্দের সঙ্গে গলা মিশিয়ে সে তার কাহিনী বলে গেল।

২

তেইশ বছর বয়স পর্য্যন্ত ঘরের কোণে কাটিয়ে যখন বাইরে পা দিলাম তখন এই কথা ভেবে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যে মানুষ ঘরের কোণটা আঁকড়ে থাকে কি সুখে! কী সে বাইরের রূপ! দেশে দেশে প্রকৃতির নব নব রূপের বিকাশ, দেশে দেশে মানুষের বিভিন্ন নিজস্ব বৈচিত্র্যময় জীবন-যাত্রাপ্রণালী। এই দুয়ে, প্রকৃতি আর মানুষে মিলে বাইরেটাকে কত রঙেই না রাঙিয়েছে! রূপসী ধরণী! বিচিত্রা!

বাবা জানতেন পড়তে গেলাম। ছাই পড়া! আমি তখন মানুষকে পড়ছি। দেড়শো কোটি নরনারীকে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে ভাগ করে ভগবান যে বইটি লিখেছেন সেই বইখানা পড়ছি। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ আমায় কি শেখাবে? মুক্তির উন্মাদনা; বাঁধন-ছেঁড়ার দৌড়ে চলা সে যে কি জিনিষ বলবার ভাষা নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই সৃষ্টি। মুক্তির

আনন্দকে নিবিড়তর করে তুলবার জন্য চারিদিকে কত বন্ধনই ছড়িয়ে আছে !

নারী।

কি অদ্ভুত সৃষ্টি বিধাতার। পথ চলতে দেবে না। মনের আনন্দে জীবনের পথে গান গেয়ে চলেছ; শ্রান্তি ক্লান্তির লেশ-মাত্র নেই, কণ্ঠে অপূর্ব্ব করুণা ফুটিয়ে বলবে, পথিক, বড় শ্রান্ত তুমি, বিশ্রাম চাই না ? এসো, তোমায় নতুন পাথেয় দেব। দেয়। কিন্তু দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে পায়ে শিকল বাঁধে !

লিওনরার গণ্ডা চারেক আত্মীয় বন্ধু বল্লে, চলো চার্চ্চে।

ভারতবর্ষের রাজাদের ওপর ওদের একটা বিশ্রী লোভ আছে। লিওনরার হাতে হাজার কয়েক টাকা গুঁজে দিতেই তার আত্মীয় বন্ধুরা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।

নোটের তাড়া নিয়ে রুমালে চোখ ঢেকে লিওনরা বল্লে, বন্ধু; তুমি কি নিষ্ঠুর !

একটা তৃতীয় নেত্র হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করল।

আমি তখন কনষ্টান্টিনোপলে। কলেজের আহমেদকে মনে পড়ে ? তারই এক খুড়োর বাড়ীতে। ইচ্ছা ছিল ভদ্রলোকের বাড়ীতে দিন দুই আতিথ্য গ্রহণ করে আফ্রিকাটা ঘুরে আসব। শুনেই খুড়োর মেয়েটি ঠোঁট ওল্টালে।

থেকে গেলাম।

দিন কুড়ি পরে খুড়োটি মুখ অন্ধকার করে বললে, সরি। গো।

'গো' আমি নিজেই করতাম; সেই দিনই বাবার অসুখের সংবাদ পেয়েছিলাম।

জগদীশ কতক্ষণ নিঃশব্দ থেকে ধীরে ধীরে বলল, আজ আমার একমাত্র সান্ত্বনা ভাই, আমার কথা তাদের মনে নেই। থাকেও না। তারা আমার যৌবনকে যে জাগরণে জাগিয়েছিল সেই জাগরণই আমার জীবনকে অভিশপ্ত করে দিয়েছে। ওই দুটি নারী যদি প্রথম যৌবনে আমার অন্তরের ব্যাকুল কামনাকে অমন করে উত্তেজিত করে না তুলত তবে হয়ত আজ আমার এমন করে জ্বলতে হত না। তারা আমায় ভুলেছে, তাদের যে ক্ষতি আমি করেছিলাম আমার ক্ষতির কাছে সে ক্ষতি তুচ্ছ হয়ে গেছে। তবু, বিদায় নেবার কালে তাদের অনুচ্চারিত অভিশাপবাণী আজও এক এক সময় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে আনে! যাক্।

জাহাজেই তাকে দেখি। মন ভারি খারাপ ছিল। ডেক চেয়ারে কাত হয়ে চোখ বুজে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করছিলাম। চোখ মেলেই দেখলাম, অদূরে রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে, আর একটু নামলেই সাগরের জলে ডুবে যাবে। পড়ন্ত সূর্য্যের সোনালী আভা তার মুখে এসে পড়েছে। চোখে আমার কি ভালই যে লাগল, পলক পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। আমার সমগ্র সত্তা মুগ্ধ হয়ে অপরিচিতা মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে রইল।

রূপ? রূপ বৈকি! দৃষ্টিকে সম্মোহিত করে মনের ভেতরে যে জিনিষ অমন আলোড়ন জাগিয়ে তুলতে পারে তাই তো রূপ! সে বছর সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর সেরা রূপসী বলে যে স্বীকৃত হয়েছিল, তাকে দেখে এসেছিলাম; তার রূপের সঙ্গে এ রূপের এতটুকুও নৈকট্য নেই। সে রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম' মুগ্ধ হয়েছিলাম, এবং চোখের আড়াল হতেই এক ঘণ্টার ভেতরে ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন সেই বাঙ্গালী তরুণীর রূপ দেখে মনে হয়েছিল, সে যেন আমারই অন্তরের আনন্দ-প্রদীপের বিচ্ছিন্ন শিখা। এতকাল পরে হঠাৎ দেখা দিয়ে আনন্দের আলোকচ্ছটায় আমার অন্ধকার অন্তর উদ্ভাসিত করে তুলেছে!

সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন।

পশ্চিমের আকাশের গাঢ় রক্তবর্ণের শেষচিহ্নটুকু ঘনায়মান কালোর মাঝে লুপ্ত হয়ে গেল। জাহাজে আলো জ্ব'লে উঠল। ধীরে ধীরে সে চলে গেল।

পরদিন আলাপ হল।

প্রথম দিন একাই দেখেছিলাম, পরদিন বিকেলে ডেক্-এ এল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে। ডেক্-এ আর বাঙ্গালী ছিল না, ভদ্রলোক বার বার আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। নীচু গলায় তরুণীকে কি বলায় স্পষ্ট বোঝা গেল সে আপত্তি করছে। কিন্তু তার আপত্তি করার মর্য্যাদা না রেখেই ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বললেন, নিশ্চয় বাঙ্গালী?

বাংলাতে বল্লাম, সন্দেহ আছে !

ভদ্রলোক ভারি খুসী। মাথা দুলিয়ে বল্লেন, ঠিক্, সন্দেহ থাকতেই পারে না, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য যাবে কোথা। হা হা হা! সেই জন্যই তো যেচে আলাপ করা। বাঙ্গালী বলে চিনতে কি আর পারিনি? ও হল যা হোক কিছু বলে কথা আরম্ভ করা। আপনি বিরক্ত হবেন ভেবে আমার মেয়ে তো আপত্তিই করছিল।

বিরক্ত হব? আপনারা বিরক্ত হবেন ভয়েই তো আমিও যেচে আলাপ করবার চেষ্টা করি নি!

ভদ্রলোক আরও খুসী। হাসতে হাসতে বল্লেন, ভাগ্যে আপনার বিরক্ত হবার রিস্কটুকু নিয়েছিলাম। না হ'লে এক জাহাজে থেকে বাঙ্গালী হয়েও পরস্পরের পরিচিত না হওয়ার কলঙ্ক থেকে যেত।

আমিও হাসলাম।

নাম শুনলাম, অনন্তলাল। কলকাতার এটর্ণি। পরিচয় ছিল না, নাম আগেই শুনেছিলাম।

বাবাকে চিনতেন, বিষয়সূত্রে পরিচয়। বাবার নাম শুনেই 'আপনি' থেকে একেবারে 'তুমি'তে নেমে গেলেন। দশ-বছরের ছেলের মত আমার পিঠ চাপড়ে সস্মিত মুখে বল্লেন, খাসা লোক তোমার বাবা। তাঁর ছেলেও যে তাঁরই মত খাসা হবে সন্দেহ নেই।

মনে মনে হাসলাম। না থাকে ভালই।

মিঃ সেন দেখলাম মনে প্রাণে নিতান্তই বাঙ্গালী। সাহেবের সঙ্গে হয়তো সাহেবী এটিকেট বজায় রেখেই আলাপ করেন, আমার সঙ্গে আলাপ করলেন একেবারে বাঙ্গালী প্রথায়। তখন আমি ভীষণ সাহেব, নকল কিনা, আসলকে ছাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে এটিকেটের অভাব থাকলেও রাগ করতে পারলাম না। খুসীই হলাম।

চিত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন, ওর জন্যই এবার বিলাত ভ্রমণটা হয়ে গেল। মিউজিক শিখছিল, এইবার ডিগ্রী পেয়েছে। আমার ছেলে শরৎ আইন পড়ছে, দুজনে একসঙ্গেই গিয়েছিল। তার পড়া শেষ হয়নি, কাজেই মেয়েকে ফিরিয়ে আনবার জন্য নিজেকেই যেতে হল। বিলাতে শিক্ষা পেলে কি হবে, বাঙ্গালীর মেয়ে তো। একা ফিরবার সাহসটুকু নেই।

চিত্রা সকোপে বলল, মিথ্যে নিন্দে করছ বাবা। আমি তো একাই ফিরব ঠিক করছিলাম, টেলিগ্রাম করে বারণ করেছিল কে?

আমার নাম শুনেই চিত্রা যে চমকে উঠেছিল সেটা স্পষ্ট দেখেছিলাম। বিলাতে শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু সে যেন কি রকম নার্ভাস হয়ে পড়ল। কি কারণে জানি না বরাবর দেখেছি মেয়েরা প্রথমটা আমাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বেশ বুঝি, আমার সঙ্গে পরিচয় না হলেই যেন তারা খুসী হত। একজন তো স্পষ্টই স্বীকার করেছিল, প্রথম দিন আপনাকে দেখে ভারি ভয় পেয়েছিলাম মিঃ মিত্র।

সকৌতুকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন বল তো?

কিছুতেই বলবে না, শেষে মুখ লাল করে বলেছিল, কী জানি। আপনার এমন মিষ্টি স্বভাব, কিন্তু প্রথম দিন মনে হয়েছিল আপনার ভেতরে কি যেন আছে, আঘাত করবে।

ব্যাপারটা অনুভূতির, ওটা বরং বুঝতে পারি। কিন্তু আমার নাম শুনে চমকাবার কি আছে ভেবে পেলাম না।

বল্লাম, কাল তো আপনাকে দেখিনি মিঃ সেন।

কাল ভয়ানক মাথা ধরেছিল। ওর মা তো কালকের সামান্য দোলানিতেই শয্যা নিয়েছেন।

মিসেস সেন সঙ্গে এসেছেন নাকি?

হ্যাঁ, ছাড়লেন না। বল্লেন, এই সুযোগে বিলাত দেখা না হলে আর হবে না।

চিত্রা বল্ল, ডেক্-এ খুব সম্ভব মাকে দেখতে পাবেন না মিঃ মিত্র। জাহাজ পোর্ট ছাড়ার পরেই শুয়েছেন, আবার পোর্টে জাহাজ পৌছলে উঠবেন। আপনি কি পড়তে গিয়েছিলেন মিঃ মিত্র?

পড়তে নয়, বেড়াতে।

বেড়াতে! সত্যি? কোথায় কোথায় ঘুরলেন?

ঘুরেছি অনেক, আজ চার বছর ঐ কাজই তো করছি!

আমেরিকায় গিয়েছিলেন?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

চিত্রা মিঃ সেনের দিকে চেয়ে বল্ল, বাবাকে কত বল্লাম, চল বাবা ঘুরে আসি। আর কি আসা হবে!

সস্নেহ অভিযোগ। মৃদু অভিমানের ছায়ায় চিত্রার মুখখানি অপূর্ব্ব হয়ে উঠল। মিঃ সেন কন্যার ডান হাতটি হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে সস্নেহে বল্লেন, সময় হ'ল না যে রে! আর তোর মা সঙ্গে রয়েছেন, অত ঘোরা কি তার পোষায়?

চিত্রা বল্লে, বুঝি ত! তবু—

মিঃ সেন বল্লেন, তবু দুঃখটা চেপে রাখতে পারি না। ভাবনা নেই রে, আমেরিকা তোর দেখা হবে। সেকালের রাজাদের মত আমিও না হয় একটা পণ ঠিক করে দেব যে বিয়ের পর আমার মেয়েকে আমেরিকা বেড়িয়ে আনবার প্রতিজ্ঞা করবে, তবে মেয়ের বিয়ে দেবো।

চিত্রার মুখের ওপর কে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিল, বল্লে, যাও! তুমি বুঝি সেকেলে রাজা?

আরে রাজা হওয়া তো সোজা! তোর মত একটি রাজকন্যা মেয়ে থাকলেই হল।

৩

মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন হ'ল না; স্পষ্টই বুঝলাম চিত্রাকে আমার চাই। এ চাওয়ার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। রূপ হিসাবে সেই তুর্কী মেয়েটির কাছে চিত্রা হয়ত দাঁড়াতেও পারবে না, কিন্তু সে মেয়েটির রূপ ছিল শুধু দেহের সৌন্দর্য্য। অন্তরের ছায়াপাতে তার বাইরের রূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত

হয়ে ওঠে নি। সে চেয়েছিল খেলা করতে, আমিও চেয়েছিলাম তাই। অন্তরের যোগ না থাকায় তাই তার অমন রূপও আমার অন্তরে রেখাপাত করতে পারেনি।

চিত্রার রূপের স্পর্শে আমার সেই জ্বালাভরা রূপপিপাসা তেমন ভাবে সাড়া দিল না। তাকে পাবার কামনা অপূর্ব্ব মধুর বেদনার রূপ নিয়ে আমার তন্তরে ভরে গেল। প্রথম দর্শনে ভালবাসা কাব্যের কথা ; সে সব কিছু নয়। কিন্তু কেমন যেন একটা নতুন রকম অনুভূতি। চিত্রাকে চাই, কিন্তু এতদিন যে ভাবে চেয়েছি সে ভাবে নয়। মনে হল কোথায় যেন একটি ফুলের কুঁড়ি ফুটে উঠছে, আমার এতদিনকার চাওয়া দিয়ে চিত্রাকে কামনা করা মাত্র সে কুঁড়িটি ঝলসে পুড়ে যাবে, ফুটবে না।

অনেক রাত পর্য্যন্ত ডেক্-এ বসে নিজের অন্তরকে একবার বুঝবার চেষ্টা করলাম।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে অনেক তারা। কোনটি শুধু চেয়ে আছে, যেন সে মহাশূন্যে চিরদিনের জন্য তার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে তার সীমা কোথায় গিয়ে মিশেছে সে কথা ভেবে পলক হারিয়ে ফেলেছে। কোনটি চপল বিরাট আকাশের বিপুল গাম্ভীর্য্যের মাঝে থেকেও চোখ টিপে টিপে কেবলি ইশারা করে চলেছে!

নিজেকে বড় ছোট, বড় অপদার্থ মনে হতে লাগল। কেউ বলে দিল না কিন্তু অন্ধকারে বসে একটা অহেতুক বেদনার

সঙ্গে আমার মনে হল, অসংযত যৌবন যেন ধাপে ধাপে আমায় পশুত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। জানি সবই, যৌবনের যত জয়গান, নর নারীর সম্পর্ক নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতের যত গভীর গবেষণা, বিশ্বসাহিত্যের নতুন প্রবাহে যৌবন বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব,—জানতে তো বাকী ছিল না কিছুই! যৌবন যখন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠেছিল তখন মনে প্রাণে বিশ্বাসও করেছি, পাপপুণ্য মিথ্যা, নরনারী পরস্পরের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, তাদের মিলনকে নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার সমাজ ধর্ম্ম কারুরই নেই! তখন জেনেছি, হিসাব করে যৌবনকে খরচ করা ভয়ের পরিচয়, যৌবনের পঙ্গুতার লক্ষণ।

কিন্তু সেদিন অন্ধকার নিশীথে মনে হয়েছিল—তাই কি? অসংযত যৌবনের পরিচর্য্যা করা পশুধর্ম্মের কতটুকু উপরে? দোষ না থাক, লক্ষ লক্ষ ঈশ্বরবিশ্বাসীর মতে যা অন্যায়, যা পাপ তা শুধু স্বভাবের নিয়ম হোক, বিজ্ঞান অঙ্ক কষে স্থির করুক, প্রেম ভালবাসা সমস্তই সেই স্বভাবের চিরন্তন দাবীর রূপান্তর মাত্র, কিন্তু সেইটুকুই কি সব? তবে সেই স্বভাবের নিয়ম মেনেই যে দুটি নারীর সঙ্গে খেলা করে এলাম তাদের কথা ভেবে আমার মনে এ আগুন জ্বলে কেন?

সংস্কার?

আজন্ম অভ্যস্ত ভাল মন্দের জ্ঞান?

সেও তো স্বভাবেরই নিয়ম!

হায়রে, তখন তো বুঝিনি! দেহের যৌবনকে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম

অস্ত্রে বিশ্লেষণ করে যে সত্য আবিষ্কৃত হল, সে যে সত্য তা অস্বীকার করা চলবে না, কিন্তু সেই সত্যের মাপকাঠিতে মনের যৌবনের বিচার করি কোন যুক্তিতে? বিকৃত যৌবন দেহের অণুতে পরমাণুতে যে অত্যুগ্র জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তারই জের টেনে চলি মনের দোর-গোড়া পর্য্যন্ত। সে যৌবন যতখানি জ্বলে, ধূমোদ্গার করে তার চেয়ে অনেক বেশী। সেই ধূমের স্পর্শে মনের শুদ্ধতম, শুভ্রতম শাশ্বত যৌবন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞানের হাটে তখন তাকে দেহের যৌবনের সঙ্গে এক দামে বিক্রি করি! আমারি মতন সর্ব্বহারা দুঃখের মাঝে যারা যৌবনের স্নিগ্ধ-শান্ত কমনীয় মূর্ত্তির দেখা পেয়েছে, তাদের বুকে লুকিয়ে থেকে যৌবনের দেবতা মানুষের নির্দ্দয় লাঞ্ছনায় কাঁদে।
একটু চুপ করে থেকে জগদীশ বল্ল, থাক গে। ও লাঞ্ছনার তো শেষ নেই, সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত সমভাবেই চলে আসছে।

জাহাজে চিত্রার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ সে দেয় নি। স্পষ্ট বুঝতাম আমায় এড়িয়ে চলতে চায়। আলাপ করত ভাসা ভাসা ভাবে, আন্তরিকতার পরিচয় পেতাম না।
জাহাজ যেদিন বোম্বে পৌঁছবে তার পূর্ব্ব দিন একটি ঘটনায় আমার প্রতি তার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। অন্ততঃ তার বাইরের ব্যবহারে অনেকটা আন্তরিকতা দেখা গেল।

সেদিন বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাস বইতে আরম্ভ করল। সাগরের ঢেউয়ের মাতলামি বেড়ে যাওয়ায় জাহাজ অত্যন্ত দুলতে লাগল। মিঃ সেন সঙ্গে সঙ্গে শয্যা নিলেন। মিসেন সেন একটু সামলে নিয়েছিলেন, দুদিন ডেক্-এও এসেছিলেন, তিনি আবার কেবিনে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। ডেক্-এ বায়ুসেবনকারীর সংখ্যা হঠাৎ আশ্চর্য্য রকম কমে গেল। চার বছরে কতবার সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছি, প্রবল ঝড়ে উত্তাল সাগরের বুকে জাহাজের অত্যধিক রকমের বিশ্রী দোলায় কতবার দুলেছি, এতো তার কাছে ছেলে খেলা। কেবিনে বন্ধ থাকা আমার পোষায় না, রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়ে জাহাজের নাগর দোলায় দুলতে ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতে লাগলাম।

মিঃ মিত্র !

ফিরে দেখি, চিত্রা।

অবাক হয়ে বল্লাম, আপনি যে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন ? জাহাজের অর্দ্ধেক লোক শুয়েছে।

চিত্রা বল্লে, বাবাও শুয়েছেন। কি করা যায় বলুন তো ?

করবার কিছু নেই। বাতাস কমলেই মিঃ সেন উঠে পড়বেন। কাল বোধ হয় পৌঁছে যাব।

কিন্তু আমারও যে মাথা ঘুরছে ; আর গা বমি বমি করছে ! কোন ওষুদ নেই ?

বল্লাম শুয়ে থাকাই সব চেয়ে ভাল ওষুদ। মাথা ঘুরছে যখন বিছানায় গিয়ে চুপ চাপ পড়ে থাকুন, আপনা হতে কমে যাবে।

ডেক্-এ বাতাসে বেড়ালে মাথা ধরাটা—হাতের রুমালের কথা ভুলে গিয়ে চিত্রা দুহাতে শাড়ীর আঁচলটা মুখে গুঁজে দিল। তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

বুঝলাম।

বললাম, শীগগির আসুন আমার কেবিনে।

বলে অগ্রসর হতেই চিত্রা আমার একটা হাত এক হাতে চেপে ধরল। পাকস্থলীর যে জিনিষগুলি বাইরে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছিল, তাদের দমন করে রাখতেই তার সবটুকু শক্তি ব্যয় হচ্ছে বুঝে আমি চিত্রার বাহুমূল ধরে নিয়ে চললাম। চিত্রাদের কেবিন জাহাজের শেষ প্রান্তে; একটু দূরে! আমার কেবিন কাছেই, দরজা ঠেলে ভেতরে আসতেই চিত্রা মেঝেতে বসে পড়ল। এতক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় দমন করে ছিল, আর পারল না। মুখে চোখে জল দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে হাত ধ'রে তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। চিত্রা তখন থর থর ক'রে কাঁপছে।

একটু সুস্থ হয়ে মাথা তুলে মেঝের দিকে চেয়ে চিত্রা বল্ল, ছি! ছি! কি করলাম! মেঝেটা নোংরা হয়ে গেল।

বল্লাম, কুণ্ঠিত হবেন না মিস সেন, ধুয়ে দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। মেথরকে ডেকে দিতে বলে দিয়েছি। আর একটু নেবু খাবেন?

চিত্রা ঘাড় নাড়ল। উত্তেজনায় তখনো তার দু'চোখ জলে পরিপূর্ণ, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বল্লে, আপনার কেবিনটা যদি

কাছে না থাকত মিঃ মিত্র, অত লোকের মাঝে ওই কাণ্ডটি করলে লজ্জায় আমি মরেই যেতাম। আপনাকে যে কি ব'লে—

লজ্জা দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সে কাজটা না হয় পরেই করবেন? বমি বমি ভাবটা কমল?

চিত্রা ঘাড় নাড়ল, একটুও না। গলাটা জ্বলছে। কি করব? শিশুর মত অসহায় প্রশ্ন! দু'বছর বিলাতে কাটিয়েছে!

কি আর করবেন? একটু শুয়ে থেকে উঠে কেবিনে চলে যাবেন।

উঠব কি ক'রে? দাঁড়ালেই এবার নাড়ী শুদ্ধ উঠে আসবে।

না না, কিচ্ছু হবে না। না হয় আপনি এখানেই থাকবেন, আমি অন্য বন্দোবস্ত করে নেব।

আপনি বোধ হয় ভাবছেন মিঃ মিত্র, এরকম তো আজ অনেকের হয়েছে, আমার মত কেউ অস্থির হয়ে পড়েনি। সত্যি বলছি, আমার মত বেশী কারো হয়নি। কি রকম যে লাগছে বলা যায় না। মনে হচ্ছে বিছানা ছেড়ে কোনদিন উঠতেই পারব না।

আগে আর হয় নি কিনা, তাই এরকম লাগছে। কালকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলে সান্ত্বনা দিলাম।

মেথর এসে মেঝে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেল।

চোখ বুজে চিত্রা কি ভাবল সেই জানে, খুব সম্ভব আমার

কেবিনে বেশীক্ষণ থাকাটা লোকের চোখে বাজবে এ কথাটা তার হঠাৎ খেয়াল হল। চোখ খুলে বল্ল, আমায় বরং কেবিনে দিয়ে আসুন।

আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন না ?

না অনেকটা ভাল লাগছে, এই বেলা যাওয়া ভাল।

আমার একটা হাত চেপে ধরে মনের জোরে কম্পিত পা দুটিকে স্থির করবার চেষ্টা করতে করতে চিত্রা তার কেবিনে প্রবেশ করল।

ফিরে এসে আমি সেই বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। মনে হল এইটুকু সময়ের ভেতরে যেন বিছানার স্পর্শটুকু পর্য্যন্ত বদলে গেছে। উপাধানে মৃদু সুবাস, যেন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে যে কুন্তলের পরশ পেয়েছিল সেই স্পর্শের অতি মৃদু স্মৃতি। ঘরের বাতাসটি পর্য্যন্ত যেন চৈত্র রাতের দখিনার মাধুর্য্যে ভরে উঠেছে মনে হল।

জগদীশ হঠাৎ চুপ করল।

আমার কাছেই পাথরের ফাটলে একটি বনফুলের চারায় একটি মাত্র ফুল ফুটেছিল। পাথরের বুকে রসের সংবাদ চারাটি কি করে পেয়েছিল সেই জানে, কিন্তু ভুল সংবাদ পায় নি। ফুল ফুটিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে। ফুলটি তুলে নাকের কাছে ধরলাম। অস্পষ্ট সুবাস। নীল সাগরের বুকে গতিশীল

জাহাজের কেবিনে আমার বন্ধুর শয্যার উপাধানটি তার প্রিয়তমার কেশের যে মৃদু গন্ধটি চুরি করে রেখেছিল যেন তারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি এই নাম-না-জানা ফুলটির বুকে ফুটে উঠেছে!

জগদীশ আবার বলতে আরম্ভ করল, বিকালের দিকে বাতাস কমে গেল। যারা বিছানা নিয়েছিলেন তারা একে একে শুকনো মুখ নিয়ে ডেকে এসে হাঁফ ছাড়লেন। মিঃ সেন, মিসেস সেন ও চিত্রা তিন জনেই এসে চেয়ার দখল করে বসে পড়ল।

হেসে প্রশ্ন করলাম, কেমন আছেন সব?

প্রত্যুত্তরে মিসেস সেন ক্ষীণভাবে একটু হাসলেন।

মিঃ সেন বল্লেন, তুমি কিন্তু মহা ভাগ্যবান!

চিত্রা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল।

চিত্রা আর আমাকে এড়াবার চেষ্টা করল না। তার ব্যবহার এতদিন যে ইচ্ছাকৃত আন্তরিকতার অভাব আমায় পীড়া দিচ্ছিল, এর পর থেকে আর তার চিহ্নও খুঁজে পেলাম না। মনে হল, ছুজনের পরিচয়ের মাঝখানে যে পর্দ্দাটি ছিল সেদিনের জোর বাতাসে সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে!

আনন্দে আমার অন্তর পূর্ণ হ'য়ে গেল। বিশেষ কিছু নয়, যে কোন পরিচিতা মেয়ে আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করত, কিন্তু

তার বিমুখতার ভাবটি কেটে গিয়ে আমাদের পরিচয় যে স্বাভাবিক স্বচ্ছতা লাভ করল তাই আমার পরম সম্পদ বলে মনে হ'তে লাগল।

কলকাতায় বিদায় নেবার সময় মিঃ সেন ও মিসেস সেন কলকাতায় এলেই তাঁদের বাড়ী যাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। চিত্রা শুধু বল্ল, আসবেন কিন্তু মিঃ মিত্র, ভুলবেন না।

আহ্বানের সুরটা আমার মনের পছন্দ হ'ল না। মনকে বোঝালাম, ওই যথেষ্ট।

বাড়ী ফিরে দেখলাম, বাবা নেই। তারপর মাস চারেকের কথা তুমি জান।

৪

বাড়ী বসে থাকতে ভাল লাগল না, হঠাৎ একদিন কলকাতা চলে গেলাম।

চিত্রাদের বাড়ী যখন গেলাম তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে এবং ড্রইংরুমে সান্ধ্য মজলিস বসেছে।

চিত্রা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল। মিসেস সেন ভারি খুসী।

চারমাস বাড়ীতেই ছিলেন নাকি মিঃ মিত্র?

হ্যাঁ।

চলুন বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। ভয়ানক কাজ পড়েছে, আপিস ঘরেই প্রায় সময় থাকেন।

ঘরের বাইরে এসে বললাম, আপনার অনেক বন্ধু জুটেছে দেখছি।

হ্যাঁ। সব গুণীলোক। মিঃ রায়ের গান শুনলে অবাক হয়ে যাবেন।

মিঃ রায়? সকলের শেষে যার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। উনিই কি মিঃ রায়?

হ্যাঁ। ভেতরে আসব বাবা?

ভিতরে মিঃ সেনের কণ্ঠ শোনা গেল, না না এসো না, তুমি এলেই মাথা গুলিয়ে দেবে।

চিত্রা হেসে বল্ল, মিঃ মিত্র এসেছেন বাবা।

মিঃ মিত্র? কোন মিঃ মিত্র? ললিতার বাবা? নাঃ, তুমি সব গোলমাল বাধিয়ে দিলে দেখছি! চলো যাচ্ছি।

চিত্রা আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলল, কাজ করবার সময় বাবা বিশ্বসংসার ভুলে যান।

মিঃ সেন দরজা খুলে আমায় দেখে বল্লেন, আরে, তুমি! তুমি আবার মিষ্টার নাকি? বিদেশে যাই হোক, দেশে ও-সব মিষ্টারের বালাই রেখো না হে!

বলে সশব্দে হাসলেন।

চিত্রা হেসে বলল, তুমিও তো মিষ্টার, বাবা।

এককালে ছিলাম, এখন আর নাই। অনন্তবাবু হতে ভারি ইচ্ছে, কিন্তু কম্বলি ছাড়ছে না! বলে আবার হাসলেন।

আমার আগমনে যে ভারি খুসী হয়েছেন এবং বিপর্য্যয় কাজের

জন্য দুদণ্ড আমার সঙ্গে গল্প করতে পারছেন না বলে যে ভারি দুঃখিত হয়েছেন বার বার একথা প্রকাশ করতে করতে ঘরে ঢুকে মিঃ সেন নথিপত্রে ডুব দিলেন। আর একটা কাজ করলেন, পরদিন আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন।

ড্রইংরুমে ফিরবার পথে বললাম, আপনার বাবার সহজ ব্যবহার আমার এমন ভাল লাগে মিস্ সেন!

চিত্রা বললে, বাবা ঐরকম, যাকে স্নেহ করেন তার সঙ্গে ব্যবহারে এক বিন্দু এটিকেট মেনে চলেন না।

স্নেহ করেন! কথাটায় অত্যন্ত খুসী হ'য়ে উঠলাম।

সকলের মিলিত অনুরোধে চিত্রা গান ধরল। নতুন শিখে আসা ইংরাজী গান, মিষ্টি করুণ সুর।

গান শেষ হলে সকলে এমন সকলরব প্রশংসা আরম্ভ করে দিলেন যে আমার অন্তরের সুর-প্রেমিক লজ্জায় মাথা হেঁট করল।

জলধি রায় কেবল দেখলাম নীরব প্রশংসায় গানের প্রকৃত মর্য্যাদা দিলেন। আরও একটা জিনিষ দেখলাম, লোকটির চেহারা। বাঙ্গালী যুবকের যে গ্রীক ভাস্করের খোদাই করা মূর্তির মত অমন চেহারা থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বড় বড় দুটি চোখে অন্তরের কবি প্রাণ উঁকি মারছে। খদ্দরের পাঞ্জাবী আর চাদর মাত্র তার পরিধানে, কিন্তু মনে হয় লোকটা কত যত্নেই না বেশভূষা করেছে! স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ, ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি। মাথার চুলে পর্য্যন্ত

বৈশিষ্ট্যের ছাপ, যে-ভাবে বিন্যাস করা আছে মনে হয় ঠিক সে ভাবে ছাড়া আর কোন উপায়েই বিন্যস্ত করা চলে না।

রায়ের দিকে চেয়ে চিত্রা বলল, প্রশংসা ?

রায় বলল, এমন ভাল লাগছিল যে প্রশংসা করতে ভুলেই গিয়েছি, এটা কি কম প্রশংসা হল ?

চিত্রা হাসল।—তা বটে, আপনার প্রশংসার অরিজিনালিটি আছে। মিঃ মিত্রকে আপনার গান শুনিয়ে দেবেন না জলধি-বাবু ? বলে আমার দিকে চাইল।

বললাম, এই মাত্র মিস সেনের কাছে আপনার গানের এমন প্রশংসা শুনেছি মিঃ রায়, যে আপনার গান না শোনার ক্ষতিটা বড় বেশী হবে বলে মনে হচ্ছে।

চিত্রা বলল, ইংরাজী নয় কিন্তু, বাংলা কিম্বা হিন্দী।

রায় বলল, তোমার ইংরাজী সুরে সবার কান ভরে আছে, একটা বাংলা গান গেয়ে সেটুকু কাটিয়ে দাও, তারপর না হয় মিঃ মিত্রের ছোট ক্ষতির অহেতুক ভয়টা বড় ক্ষতি দিয়ে মিটিয়ে দেব।

রায়ের তুমি সম্বোধনটা আমার কানে বাজল।

চিত্রা হেসে বলল, কি গাইব ?

ফরমাস ? আচ্ছা গাও—এই লভিনু সঙ্গ তব।

কারণ কি বোঝা গেল না, রায়ের ফরমাস শুনে চিত্রার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। স্পষ্ট বোঝা গেল ও গানটা গাইতে তার বিশেষ আপত্তি আছে। ভারি বিস্ময় বোধ হল।

একটু ইতস্ততঃ করে চিত্রা গাইল। কবির অন্তরে সুন্দরের সঙ্গলাভে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দসুধা সঞ্চিত হয়েছিল ছন্দে গাঁথা কথার চারিদিকে সুরের মালা জড়িয়ে সেই আনন্দে বাইরে প্রকাশ করবার চেষ্টা শ্রবণে যেন মধুবর্ষণ করে গেল।

চিত্রার পর রায় গাইল। হিন্দী গান। সুন্দর জমজমাট গলা, গাইবার ভঙ্গি চমৎকার। রাগরাগিণীর জ্ঞান আমার খুব টনটনে নয়, কিন্তু মালকোষ বলেই চেনা চেনা ঠেকল। অনাড়ম্বর চেষ্টায় প্রকৃত সাধকের মত রায় গেয়ে গেল। আনন্দ পেলাম অনেকখানিই, কিন্তু গান যখন শেষ হল তখন আমার মনে হল কি রকম একটা অস্বস্তি সেই আনন্দের গলা টিপে ধরেছে।

চিত্রার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। জলধি রায়ের অমন অনবদ্য সুর-সৃষ্টির গর্ব্বটা যেন তারই।

বাইরে তখন জ্যোৎস্নার বান ডেকে গিয়েছে। বাগচি প্রস্তাব করল, লনে গিয়ে চায়ের সঙ্গে জ্যোৎস্না উপভোগ করা যাক্।

চিত্রা বলল, চায়ের সঙ্গে জ্যোৎস্না। আপনি হাসালেন মিঃ বাগচি।

হাসালাম? কবি ছাড়া জ্যোৎস্নার উপভোগের এমন চমৎকার উপায় আর নেই মিস সেন।

কবি ছাড় কেন?

কবির কি দোমনা হবার সাধ্য আছে যে একসঙ্গে চা আর জ্যোস্না উপভোগ করবে।

সবাই হাসল।

মিসেস সেন বললেন, হিম লেগে তোমাদের অসুখ করবে। কার্ত্তিকের জ্যোৎস্না উপভোগের জন্য নয়।

বোস হাসি মুখে বলল, ডোণ্ট ইন্‌সাল্ট আওয়ার ইয়ং এজ্, মিসেস সেন।

লনে যেতে একপাশে ফুলের বাগান। পথের ধারেই ছোট্ট একটি গোলাপ চারায় প্রকাণ্ড এক রক্ত গোলাপ ফুটে আছে দেখলাম। অন্য চারায় অজস্র ফুল কিন্তু সে চারটির সম্পদ ঐ একটি। সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মেখে নিঃসঙ্গ ফুটে আছে।

বললাম, ভারি সুন্দর ফুলটি তো। কতটুকু চারায় ফুটেছে।

চিত্রা থমকে দাঁড়াল।

ফুলটি তুলে নিয়ে এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করল। তারপর রায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনার গান আজ ভারি আনন্দ দিয়েছে জলধিবাবু, এই ফুলটি আমার হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

রায় হাত বাড়িয়ে ফুলটি নিয়ে অস্ফুটস্বরে কি বলল বোঝা গেল না।

জ্যোৎস্নার দীপ্তি নিমেষে আমার চোখে ম্লান হয়ে গেল। জেলাসি নয়, ঈর্ষার জ্বালায় মাধুর্য্য আছে। অপমানের জ্বালায় জ্বলুনি ছাড়া আর কিছু নেই। জ্যেৎস্নালোকে চিত্রার অপূর্ব্ব সুন্দর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে কামনা করলাম, এই শরতের জ্যোৎস্না শ্রাবণের মেঘে ঢেকে দিক্। জ্যোৎস্না থাকবার কোন প্রয়োজন আজ আর নেই।

রায়ের হাতের গোলাপটির ওপর চোখ পড়ল, মনে হল আমার সবটুকু রক্ত জমাট বেঁধে ওই ফুলটির সৃষ্টি হয়েছিল, আমার অন্তরের মালঞ্চ হতে চিত্রা সেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।
এত গম্ভীর হ'য়ে পড়লেন যে মিঃ মিত্র ?
চমকে চিত্রার মুখের দিকে চাইলাম। হৃদয়হীন মানুষের নিষ্ঠুরতারও সীমা আছে, নারীর নিষ্ঠুরতার সীমা নির্দ্দেশ করতে ঈশ্বরের বোধ হয় ভুল হয়েছিল। এক মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেল। হেসে বললাম, জ্যোৎস্না দেখে ভাব লেগেছে মিস সেন।
কিন্তু এদিকে চায়ের যে শীত লাগবার উপক্রম হল।
অনাবশ্যক হাসি হেসে বললাম, চা তুচ্ছ। এমন জ্যোৎস্না—
রায়ের দিকে নজর পড়ল। তার মুখে হাসি নেই, মুখে বেদনার ছাপ। উপহারের গোলাপটি নাকের কাছে ধরে স্থির ম্লান দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সহানুভূতিভরা করুণ দৃষ্টি। চোখের দৃষ্টি যে মানুষকে এতখানি লজ্জা দিতে পারে আর অপমান করতে পারে সেই দিনই প্রথম অনুভব করলাম। ইচ্ছে হতে লাগল চায়ের চামচ দিয়ে লোকটার বড় বড় চোখ দুটি উপড়ে আনি। কিন্তু হাসিমুখেই বললাম, মিঃ রায়, শুনলাম আপনি নাকি সুন্দর বাঁশীও বাজাতে পারেন। আপনার গান শুনে যারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে, বাঁশী বাজিয়ে তাদের একেবারে আত্মহারা করে দিন না? এমন জ্যোস্না, একটু বাজালে, কৃতার্থ হব।

চিত্রার মুখের দিকে চাইলাম, আঘাতটা ঠিক পৌঁচেছে কিনা। চিত্রার মুখ মুহূর্ত্তের জন্য একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল। বোঝা গেল, আমার খোঁচাটা সূক্ষ্ম বলে বেজেছেও বড় তীক্ষ্ণ হয়ে। রায় প্রশংসার প্রতিবাদ করল না, বিনয় প্রকাশের চেষ্টা করল না, শুধু বলল, বাঁশী তো এখানে নেই।

নেই? ও!

পরদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম।

মিঃ সেন দেখলাম সেদিন অন্য সকলকে একেবারে বাদ দিয়েছেন, নিমন্ত্রিত আমি একা।

চেয়ারে বসেই বিনা ভূমিকায় ব'লে বসলাম, কাল রাত্রের গাড়ীতে পুরী যাচ্ছি মিঃ সেন।

চিত্রা চমকে আমার মুখের দিকে চাইল। মিসেস সেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে হাসি পেল। মিষ্টার সেন আর মিসেস সেনের মনোভাব তো আমার অজানা ছিল না।

এমন হঠাৎ?, মিসেস সেন প্রায় কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

হেসে বললাম, হঠাৎ নয়, বাড়ী থেকেই ঠিক ক'রে বার হয়েছিলাম।

পুরীতে থাকব না, ঘুরে বেড়াব। পরের দেশ দেখতে চার বছর কাটিয়ে এলাম, নিজের দেশটা ভাল ক'রে দেখা উচিত।

কবে ফিরবে?

তার কোন ঠিক নেই। কোন প্রোগ্রাম করিনি। যেখানে ভাল লাগবে কিছুদিন থাকব। পাঁচ ছ'বছর তো লাগবেই।

পাঁচ ছ' বছর!

মৃদু হেসে বললাম, বাড়ী ব'সেই বা কি করব বলুন? দূর-সম্পর্কীয় ছাড়া আত্মীয় কেউ নেই, তাদের কাছে থাকার চেয়ে দূরে থাকাতেই ভাল লাগে।

মিষ্টার সেন বল্লেন, এ রকম ঘুরে ঘুরেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে নাকি?

হেসে ইংরাজিতে বললাম, তাকি বলা যায়। কবে কার বাঁধনে ধরা পড়ে যাব ঠিক কি? কি জানি কখন সে দুর্ভাগ্য হয়, এই বেলা স্বাধীনতাটুকু ভোগ ক'রে নি! নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলাম।

চিত্রা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার কিছু বলা কর্ত্তব্য মনে করেই বলল, পুরী কেন? সমুদ্র তো আপনার দেখা আছে।

তা আছে সমুদ্র দেখার জন্য নয়। জগন্নাথের দিকেও বিশেষ টান নেই। একজন বন্ধুর অসুখ, কিছু টাকা চেয়েছে। ভাবছি. নিজে গিয়ে দেখে আসি। না হলে দিল্লি আগ্রার দিকেই আগে যেতাম।

বন্ধুর কথাটা সত্য। সকালে বন্ধুর চিঠি পেয়েছিলাম।

চিত্রা বলল, বন্ধুর কি অসুখ?

টি বি।

টি বি। তিনজনেই চমকে উঠলেন। চিত্রার মুখ একেবারে

বিবর্ণ হয়ে গেল। কেন যে গেল সে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করবার ইচ্ছা বা শক্তি দুয়েরই তখন অভাব। এখন সে চেষ্টা করতেও ব্যথা বোধ হয়।

ডিনারের পর মিনিট দশেক বসেই টের পেলাম এবার চিত্রার মা বাবা দুজনেই অন্য ঘরে গিয়ে আমাদের নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ দেবেন। কাজের ছুতা ক'রে উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার সময় বললাম, যেখানেই থাকি, মিস্ সেনের শুভ পরিণয়ের সংবাদ পেলেই ছুটে আসব।

চিত্রার বিবর্ণ মুখ একবার আরক্ত হয়েই ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

পুরী পৌঁছে বন্ধুর কাছে যাবার পথে মন্দির পড়ল। চৌমাথায় গাড়ী যেতেই নেমে পড়লাম। মন্দিরে উঠে অভ্যন্তরের আবছা আলো আর প্রদীপের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দশ বছর বয়সের পর কখনো যা করিনি হঠাৎ তাই করে বসলাম। একেবারে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মনে মনে বললাম, তোমার প্রতি আমার ভক্তির যে নিতান্তই অভাব সেকথা তুমিও জান আমিও জানি। শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা তো পেয়েছ, আমার একটুখানি ভক্তি দিয়ে তুমি কি করবে? যদি পার নিঃস্বার্থ ভাবেই এইটুকু দয়া কোরো ঠাকুর, তোমার সৃষ্ট এই অগ্নিশিখাগুলিকে আমার নয়ন পথের অন্তরালেই রেখো।

উঠে দাঁড়াতেই এক পাণ্ডা গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বলল, মনস্কামনা পূর্ণ হবে বাবু।

তথাস্তু। পাণ্ডাটির মনস্কামনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করে দিলাম। বন্ধু আমায় দেখে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলল। অর্থাভাব এবং রোগের পীড়নে দেখলাম মরণের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

বন্ধুর ব্যবস্থা করতেই সমস্ত দিন কেটে গেল। সন্ধ্যার পরেই নিশ্চিন্ততার আরামে বহুকাল পরেই বোধ হয় বন্ধু বিছানায় আশ্রয় নিতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

নিস্তব্ধ বাড়ীতে বসে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না। ধীরে ধীরে সমুদ্রতীরে গিয়ে ফ্ল্যাগষ্টাফের কাছে পাকা বাঁধানো একটি আসনে বসে পড়লাম।

সেইখানে বসে চিরবিচ্ছেদের বেদনা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্তরের এক অপূর্ব্ব তত্ত্ব আবিষ্কার করলাম। চিত্রার রূপকে নয়, চিত্রাকেই আমি ভালবাসি। তীব্র বেদনার মাঝে এই সত্যের অনুভূতি আমায় খুসী ক'রে তুলল।

পূর্ণিমার লঘু শান্ত জ্যোৎস্নার সঙ্গে উর্ম্মিপাগল উচ্ছ্বসিত সাগরের অপরূপ মিলনের দিকে চেয়ে স্পষ্ট অনুভব করলাম পৃথিবীর তুচ্ছ সুখ দুঃখ মিলন বিচ্ছেদের বহু উর্দ্ধে আমি চলে গেছি। আমার পিছনেই কালো ইংরাজী অক্ষরে 'পুরী' লেখা বাড়ীটার মাথার ওপরে একটা আলো ঘুরে ঘুরে চারিদিকে সঙ্কেত পাঠাতে লাগল। মনে হল আমার অন্তর-সমুদ্রের কোনো তীরে এমনি একটি মৃদু আলো জ্ব'লে আমার দিক্‌হারা মনের সন্ধানে দিকে দিকে তার ক্ষীণ রশ্মিরেখার সঙ্কেত প্রেরণ

করছে। পাগলের মত মন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটেবেড়াচ্ছিল হঠাৎ সেই সঙ্কেতের অস্পষ্ট অর্থ বোধ করে থমকে দাঁড়িয়ে সলাজ-শঙ্কিত-আনন্দের দৃষ্টিতে সেই আলোটির দিকে চেয়ে আছে।

ডাক্তার বললেন, পুরীতে উপকার হবে না।

বললাম, চলো বন্ধু, রাঁচি যাবো তোমার সঙ্গে।

বন্ধু কুণ্ঠীত হয়ে বলল, ছোঁয়াচে রোগ—

তার একটা হাতচেপে ধরে বললাম, বন্ধুর কাছে বন্ধুর রোগ আবার ছোঁয়াচে হয় নাকি?

কৃতজ্ঞতায় মৃত্যুপথযাত্রীর চোখে জল এল। হায় রে! ছলনার ভালবাসারও এত দাম!

লালপুরে বাড়ী ভাড়া করলাম। একমাস পরে বন্ধুটি ইহলোক ত্যাগ করল।

সকালে বাড়ীর সামনে বাগানে দাঁড়িয়ে একটি সদ্য ফোটা লাল গোলাপের দিকে চেয়ে চিন্তা করছি পরদিনই পশ্চিমে পাড়ি জমাব কি না, চেনা গলার ডাক শুনলাম, মিঃ মিত্র!

চমকে চাইলাম।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে চিত্রা!

বললাম, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

আমিও আপনাকে বাগানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি। ভাবতেও পারি নি সকালে বেড়াতে বেরিয়ে আপনার দেখা পেয়ে যাব।

কবে এলেন আপনারা ?

কাল সকালে। আপনি ?

মাসখানেক এসেছি। মা বাবা ভাল আছেন ?

মার ভারি অসুখ হয়েছিল। সেইজন্যই তো আমাদের আসা। এখন বাবা ভাল আছেন। আসুন না আমাদের বাড়ী ?

আসব ? আচ্ছা।

ঘুরে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল সেই গোলাপটি। তুলে নিয়ে এসে চিত্রার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, হঠাৎ দেখা দিয়ে আপনি যে আনন্দ দিয়েছেন মিস সেন, এ ফুলটি আমার হয়ে সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

চিত্রার মুখ হাতের ফুলটির মতই লাল হয়ে উঠল। ফুলটি নিয়ে সুবাস অনুভব করার ছলে সে মাথা নীচু করল।

আমায় দেখে মিঃ সেন মহা খুসী। মিসেস সেন আরও। মিসেস সেনের চেহারা দেখেই বোঝা গেল কঠিন অসুখ থেকে উঠেছেন। গল্প চলল।

মিসেস সেন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, কতদিন থাকবে এখানে ?

চলে যাবার কথা ভাবছি শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমরা এলাম অমনি তুমি চলে যাবে ? তাহলে আমাদের মনে হবে আমরা এসেছি বলেই তুমি চলে যাচ্ছ।

সবিনয়ে প্রতিবাদ করলাম। বললাম, আপনারা এসেছেন জানবার আগেই আমার অর্দ্ধেক জিনিষ গোছান হয়ে গেছে।

চিত্রা হঠাৎ কি ভেবে বলল, কিছুদিন থেকে যান না মিঃ মিত্র ?

কাজ তো নেই, দুদিন পরে বেড়াতে গেলে আর কি ক্ষতি হবে? আপনি থাকলে বেশ আনন্দে দিন কাটবে।

বললাম, থাকব কি মিস্ সেন, আপনি কি আমায় থাকতে দেবেন?

তার মানে?

আপনি যদি মিঃ মিত্র বলে ডাকেন তাহলে কি করে থাকি বলুন?

চিত্রা হেসে বলল, আপনার পচ্ছন্দ নয় বুঝি? কি বলে ডাকব তবে? জগদীশ বাবু

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি আমায় মিস সেন মিস সেন করবেন আর আমি আপনাকে জগদীশ বাবু বলব, সে ভারি বিশ্রী শোনাবে। আপনি যদি আমায় চিত্রা বলেন, তাহলে রাজি আছি।

নাম ধরে ডাকলে চটবেন না ত?

চিত্রা হেসে বলল, নাম ধরে ডাকলে চট্‌ব না, কিন্তু নাম ধরে ডেকে যদি আপনি বলে কথা কন তাহলে চটব।

মিসেস সেন সে বেলা তাদের ওখানে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

চিত্রা বলল, আমি নিজে রাঁধব জগদীশ বাবু।

বাড়ী ফিরে মনে হল, জীবনের পাত্রে সঞ্চিত সমস্তটুকু বেদনা এই ক'ঘণ্টায় উপে গিয়ে সেই শূন্য পাত্র অকস্মাৎ সুধাবর্ষণে পূর্ণ হয়ে গেছে।

বিচিত্র জীবন। বিচিত্র তার দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ।
সন্ধ্যার পর চিত্রা গান শোনাল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাদের ওখানে থেকে ফিরলাম। জ্যোৎস্নায় তখন চারিদিক ভরে গেছে। বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে জ্যোৎস্নালোকে অদূরে আবছা মোরাবাদী পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলাম। বাইরের জ্যোৎস্না আমার অন্তরের জ্যোৎস্নার কাছে তখন ম্লান হয়ে গেছে।
ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গল, অন্ধকার নেই। ঠিক সামনে গাছপালার ওদিকে বুঝি সূর্য্য উঠবে, আকাশের গায়ে রঙের ছাপ পড়েছে। সোজা হয়ে বসে সিগারেট ধরালাম।
খুব ভোরে উঠেছেন যে।
চিত্রা এসে দাঁড়াল।
বোসো। এখনো উঠি নি।
ওঠেন নি মানে?
মানে, ঘুম ভেঙ্গেছে বটে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠা হয় নি।
এই চেয়ারটাতেই কাল বিছানার কাজ চালিয়েছিলেন বুঝি? বেশ লোক তো?
বললাম, ইচ্ছে করে নয়, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার স্নান পর্য্যন্ত হয়ে গেছে দেখছি।
সকালে স্নান না করলে আমার ভারি বিশ্রী লাগে। উঃ, আকাশটা কি রকম লাল হয়ে উঠল দেখেছেন?
আকাশ নয়, আমি তখন চিত্রাকে দেখছি। ভেজা ফুলের মত মুখখানিতে না-ওঠা সূর্য্যের আভা লেগে যে সৌন্দর্য্য সেদিন

জেগেছিল, দেখে মনে হয়েছিল কোন্ পুণ্যে আমার চোখ দুটির অতবড় সৌভাগ্য সম্ভব হল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল, তোমাকে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছে চিত্রা।

কবির চোখে কি না সুন্দর লাগে বলুন? বেড়াতে যাবেন?

চিত্রার সহজ কণ্ঠে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হল। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল।

ফিরবার পথে হঠাৎ চিত্রা প্রশ্ন করলে, আপনার কি কোন অসুখ হয়েছিল ?

না। কেন বলত?

রোগা হয়ে গেছেন।

চিত্রা!

বলুন।

আমার একটা কথা রাখবে ? আমাকে আপনি বোলো না।

চিত্রার মুখ গম্ভীর হল। একটু চুপ করে থেকে বলল, কি যে বলেন। জগদীশবাবু বলা চলতে পারে, তুমি বলা কি সম্ভব?

সম্ভব নয়?

আপনিই ভেবে দেখুন সম্ভব কি না। রাগ করবেন না, বুঝে দেখুন।

না, রাগ করব কেন?

চিত্রা একবার আমার মুখের দিকে চাইল কিন্তু কিছু বলল না। নিঃশব্দে বাকী পথটুকু অতিবাহিত হয়ে গেল।

গেট পার হয়ে বাগানের মাঝামাঝি গিয়েছি, চিত্রা ডাকল, জগদীশবাবু একটু দাঁড়ান।

দাঁড়ালাম।

রাগ করে আমাদের বাড়ী যাওয়া যেন বন্ধ করবেন না।

রাগ তো আমি করিনি। রাগের কি আছে?

না থাকলেই ভাল।

বলে চিত্রা চলে গেল। যে কথা বলে গেল সে কথা বলতে সে যে আমায় দাঁড় করায়নি সেটুকু বেশ বুঝতে পারলাম। বুঝে হঠাৎ খুসী হয়ে উঠলাম। মূর্খ আমি অন্ধ আমি, তাই।

স্থানীয় সিভিল সার্জ্জেনের সঙ্গে বিলাতে পরিচয় হয়েছিল। তিনি আর তাঁর স্ত্রী বিকালে এক রকম জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন। যখন ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে।

ফিরেই চিত্রাদের বাড়ী গেলাম। মিস্টার সেন আর মিসেস সেন বেড়াতে গিয়ে ফেরেন নি। চিত্রা এক ইজিচেয়ারে চুপচাপ পড়ে আছে। তার বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

পায়ে কি হল?

মচকে গেছে।

কি করে মচকাল?

সিঁড়িতে পা পিছলে গিয়েছিল। বসুন।

খুব ব্যথা হয়েছে?

না, সামান্য। মা বাবা দু জনেই বেরিয়েছেন, একা একা এমন

বিশ্রী লাগছিল! ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন জগদীশ বাবু।
খুশি হয়ে বললাম, বাইরে চল, জ্যোৎস্নায় বসা যাবে। ভারি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা।
মাথা নেড়ে চিত্রা বলল, পূর্ণিমা নয় চতুর্দ্দশী, এক কলা এখনো বাকী আছে। যেতে তো ইচ্ছে করছে, কি করে যাই?
সেও একটা কথা বটে। থাক্ পায়ে আবার লাগবে।
ডান হাতটি নিঃসঙ্কোচে বাড়িয়ে দিয়ে চিত্রা বলল, ধরুন, হাঁটতে পারি কি না দেখা যাক। এইটুকু তো।
হাত ধরে সন্তর্পণে চিত্রাকে দাঁড় করালাম। বাঁ পায়ের ওপর ভর দেবার চেষ্টা করে বললে, উঁহুঁ, লাগছে। আর একটু সরে আসুন, ভাল করে ধরি।
স্পন্দিত বক্ষে কাছে সরে গেলাম। চিত্রার শাড়ীর প্রান্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ করল। তার কেশের সুবাস আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে দিল। ডান হাতখানা আমার কাঁধে রেখে শরীরের সবটুকু ভার আমার ওপরে দিয়ে চিত্রা বলল, চলুন।
চলব? কোথা চলব? পায়ের নীচে তো মাটি ছিল না। বিশ্ব তখন লুপ্ত হয়ে গেছে, দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে পাগলের মত নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিঃশেষে মুছে গিয়ে কালের মহাশূন্যে কেবল বর্তমানের ক্ষণটি দুলছে। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত কামনার উষ্ণ নিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত সেই ক্ষণটি যেন আমার জন্মজন্মান্তরের সম্পদ,—অতীতকে মুছে নিয়ে, অসহ দ্যুতিময় তৃষ্ণা-যবনিকার অন্তরালে ভবিষ্যৎকে

আড়াল করে সেই ক্ষণটি যেন আমার কানে কানে মিনতি করে গেল, নাও, নাও, এইবেলা যুগ যুগান্তের সঞ্চিত তৃষ্ণা মিটিয়ে নাও।

সংজ্ঞা ফিরতে দেখলাম আমার দুই বাহুর বেষ্টনে চিত্রা আমার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, আমি তার ওষ্ঠে গালে কপালে পাগলের মত চুম্বনের পর চুম্বনের রেখা মুদ্রিত করে দিয়ে চলেছি।

চিত্রা যখন মুক্তি পেল তখন তার মুখ মৃতের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে।

একটা চেয়ারের পিঠ চেপে ধরে সে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

চিত্রা।

যান্!

চিত্রা খোলা দরজার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দিল।

আমার একটা কথা শোনো চিত্রা, তারপর তাড়িয়ে দাও, চলে যাব।

কথা? যা বলবেন আমি জানি, শোনাবার দাবী ইচ্ছে করে খুইয়েছেন। যান।

শুনবে না?

না, না, না। আমি লিওনরা নই। আমি দাঁড়াতে পারছি না, পায়ে লাগছে।

সেইদিন যদি আমাদের দুজনের অদৃষ্টে যে জট পাকিয়েছিল তার সব কটি পাক খুলে যেত! আজ এ বেদনা হয়ত এমন কঠিন, এমন জ্বালাময়, এমন অসহ্য হত না। দূর থেকে দেখতাম তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে সে মিলিত হয়েছে, আমার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে সে সুখী হয়েছে। আমার সমস্ত ক্ষতি, সমস্ত লজ্জা, প্রিয়বিরহের সবটুকু বেদনা, ক্ষণিকের ভুলের জীবনব্যাপী অনুতাপ এ সমস্তই যাকে ভালবাসি সে সুখী হয়েছে এই সান্ত্বনার কিরণসম্পাতে সহনীয় হয়ে উঠত। কিন্তু তখনো বাকী ছিল।

পরদিন সকালেই রাঁচি ত্যাগ করলাম।

আমার দুর্ভাগ্য, অমন একটা ঘটনার পরেও আমার আশা-দীপ একেবারে নিভে গেল না। সব আশা তো মিটেছে, কিন্তু চিত্রার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে প্রত্যেকটি ছোট বড় ঘটনা বার বার তন্ন ক'রে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলাম, যদি কোন আশা এখনো থাকে! ক্ষীণ হোক আশা আছে, এ সান্ত্বনা ছাড়া যেন বেঁচে থাকাই অসম্ভব মনে হ'ল।

মুহূর্ত্তের ভুল। ওই ভুলটি না করলে চিত্রা একদিন আমার হ'ত। লিওনরার কথা জেনেও সে দিনের পর দিন আমার কাছে সরে আসছিল। একদিন সত্যকার ভালবাসার দাবীতে আমার অতীতের দুর্ব্বলতার কথা তুচ্ছ করে দিয়ে চিত্রা একান্তভাবে আমার হত।

আমার হত!

মনে করতেও রক্তস্রোত যেন থেমে যাবার উপক্রম হল! চিত্রা আমার হত, আমার একমুহূর্ত্তে নিজের হাতে সে সম্ভাবনাকে অসম্ভবই হয়ত করে দিয়ে এসেছি!

পনের দিন ধরে ভাবলাম আর জ্বললাম। তারপর মনস্থির হয়ে গেল! চিত্রার সঙ্গে একটিবার দেখা করে অন্তরের সবটুকু তার সামনে ধরে দেব। যদি আমার নিমেষের ভুলকে ক্ষমা করে থাকে, চিরজীবনের মত শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাব। এই স্থির করার পর আমার মন হঠাৎ আশ্চর্যরকম স্থৈর্য্য লাভ করল। আশা কেবলি আমার কানে গুঞ্জন করতে লাগল, সে ক্ষমা করেছে।

উত্তেজনার মুখে সে যা বলেছে, সেটা সত্য নয়, তার অন্তরের কথা নয়। তার মন শান্ত হয়েছে, নিমেষের ভুলে যে সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে নেই একথা সে এখন বুঝছে।

যদি অপমান করে! অপমান? শুধু চিত্রাকে নয়, নিজের ভালবাসাকে যদি আমি অত বড় অপমান করতে পেরে থাকি, চিত্রার দেওয়া কোন অপমানকেই তো অপমান ভাববার অধিকার আমার নেই।

আমার তখনকার মনের ভাব ঠিক করে বর্ণনা করা অসম্ভব। কত বিরুদ্ধ চিন্তা, কত অসম্ভব কল্পনা, কত যুক্তি কত তর্ক দিয়ে যে আমি তখন আমার জ্বালাভরা অনুতপ্ত মনের অগ্ন্যুত্তপ্ত আত্মগ্লানির তীব্রতা কমিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলাম তার সীমা ছিল না।

চিত্রার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুখ ফুটে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারব কিনা সন্দেহ হল। শেষ চিঠিখানা জোর ক'রে খামে ভরে ফেললাম। মুহূর্ত্তের উত্তেজনা, নিমেষের ভুল ওই সব লিখতে লজ্জা বোধ হল। নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাবার আশা জানিয়ে, সারা জীবন যে আমি এই চিঠির জবাবের প্রতীক্ষা করব এই কথা লিখে শেষ করলাম। কত কি লিখবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগছিল! মনে মনে বললাম, ভালই যদি বাসে আমার অকথিত বাণী তার মনের দুয়ারে পৌঁছবে, মুখ ফুটে বলার প্রয়োজন হবে না।

সে চিঠি তাকে দেওয়া হয় নি। এই পাষাণভরা নদীগর্ভে সে চিঠি হারিয়েছে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অক্ষর যে এখনো কেঁদে বেড়াচ্ছে, এখানে এলেই আমি স্পষ্ট অনুভব করি।

জগদীশ থেমে গেল। তার চোখে জল নেই, কিন্তু মনে হল, তার চোখের অন্তরালে অনলকণা আর অশ্রুধারা এক সঙ্গে বর্ষিত হচ্ছে।

প্রায় দশমিনিট নিঃশব্দ থেকে জগদীশ আবার সুরু করল।

রাঁচি ফিরলাম। ষ্টেশন থেকে সোজা চিত্রাদের বাড়ী গেলাম। কেউ বাড়ীতে নেই। চাকর জানাল, সকলে হুড্রু গেছে।

হুড্রু রওনা হলাম। চিত্রার পায়ে ব্যথা, এই কদিনে কম্‌লেও হয়ত সে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে প্রপাতের নীচে নামতে

পারবে না। মিঃ সেন আর মিসেস সেন যদি প্রপাতের সৌন্দর্য্য দেখতে নীচে নামেন, চিত্রা একা থাকবে। সেই হবে আমার সুযোগ। প্রকৃতির উদারতার ছাপ লাগবে চিত্রার মনে। চারিদিকের শান্ত কোমলতা তার অন্তরের কাঠিন্য গলিয়ে দেবে।
তিনজনে এক পাথরে ব'সে চা পান করছিলেন, আমি দূরে এক পাথরের আড়ালে ব'সে চেয়ে রইলাম। আধঘণ্টা পরে দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে মিষ্টার সেন আর মিসেস সেন নীচে চলে গেলেন।
চিত্রা উঠে ধীরে ধীরে প্রপাতের মুখের দিকে অগ্রসর হল।
মিনিট দশেক চুপচাপ বসে থেকে জোর করে উঠে পড়লাম। একটা উঁচু পাথরে উঠে নজরে পড়ল ঢালের ধারে বসে চিত্রা নীচের দিকে চেয়ে আছে।
পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে চিত্রা চমকে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে ভীত বিবর্ণ মুখে আমার দিকে চেয়ে রইল। বুঝলাম এই নির্জ্জনে অকস্মাৎ আমার আবির্ভাবে চিত্রা ভয় পেয়েছে! বুক-পকেট থেকে চিঠিটা বার করতে করতে দুপা অগ্রসর হয়ে বললাম, চিত্রা—
অস্ফুট শব্দ করে চিত্রা সভয়ে পিছিয়ে গেল। দাঁড়িয়েছিল একেবারে ধারে। হঠাৎ চিত্রা এক নিমেষে আমার দৃষ্টিপথ থেকে মুছে গেল।
তারপর নিকষকালো অন্ধকারে বিশ্ব ঢেকে গেল। যখন সংজ্ঞা ফিরল তখন—তখন—

শেষের দিকে জগদীশের কণ্ঠ ক্রমেই বিকৃত এবং অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল ; হঠাৎ সে সেই পাথরের ওপরেই ঢলে পড়ল। মুখের দিকে চেয়েই বুঝলাম সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

আর একটি কথা বললেই এ কাহিনী শেষ হয়। চিত্রা জগদীশকে ভালবাসত।

আমার পাঠক বিশেষতঃ পাঠিকারা, প্রশ্ন করবেন, কি করে জানলে ?

সেই জলধি রায়। জগদীশের মুখ থেকে তার জীবনের এই শোচনীয় কাহিনী শোনার প্রায় পাঁচ বছর পরে জলধির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কি সূত্রে পরিচয় হয়েছিল, বলবার প্রয়োজন নেই।

জলধি চিত্রাকে ভালবাসত ; যেদিন সে তার মনের কথা চিত্রাকে জানায়, চিত্রা ব্যথিত হয়ে তাকে জগদীশের কথা বলেছিল।

ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় জলধি জগদীশের য়ুরোপ প্রবাসকালের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা জানাতে চিত্রা বলেছিল, সে আমি জানি জলধিবাবু। এ জীবনে আমাদের মিলন সম্ভব হবে কিনা ঈশ্বর জানেন। সত্য ভালবাসা যদি তার বুকে জাগে ধরা দেব। আর যদি আমার রূপটাই তার কাম্য হয়ে আমার ভালবাসার অপমান করে তো তার সেই কামনা আমি কোনদিনই মেটাব না।

দূর আকাশের দিকে স্বপ্নের দৃষ্টি মেলে বলেছিল, তাঁর ভেতরে বড় দ্রুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে জলধিবাবু। আমার ভালবাসা ব্যর্থ হবে না, একদিন আমার রূপকে নয়, আমাকে তিনি ভালবাসবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জগদীশের বন্ধুর মুখে না বলিয়ে কাহিনীটা এবার আমি নিজেই বলে যাই।

কতদিক দিয়ে অসম্পূর্ণ জগদীশের জীবনের এই ট্র্যাজেডি। জীবন ও জগৎ কতদিক দিয়ে অস্বীকৃত !

যে বলছে জগদীশের জীবন-কাহিনী, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের যে মানুষটা ছেলেবেলা থেকে ধনীর ছেলে জগদীশের সবচেয়ে আপন, একমাত্র বন্ধু—বাপের টাকায় চরম উচ্ছৃঙ্খলায় বিদেশ চষতে বেরোবার সময় জাহাজে উঠবার আগে যার কাছে বিদায় নিতে জগদীশ কেঁদে ফেলেছিল—সে এই কাহিনীতে আছে কি ভাবে ?

জগদীশের কাহিনীকে করুণরসে ফেণাবার জন্যই যেন তার মানুষ হয়ে জন্মানো, তার হৃদয়-মনের কারবার যেন শুধু সেইটুকু চিন্তাভাবনা অনুভূতি নিয়ে যা স্বদেশী ও বিদেশী বিকারে উন্মাদ জগদীশের সত্যিকারের ভালবাসার মারাত্মক ট্র্যাজেডিকে ফেণায় !

সে এম, এ পাশ করে চাকরী নিয়ে অল্পবয়সী একটি মেয়েকে বিয়ে করে সাধারণ সংসারী মানুষ হয় শুধু বেপরোয়া ছন্নছাড়া বন্ধুর অসাধারণত্বকে, অস্বাভাবিকত্বকে প্রকট করতে।

হুড্রুর জলপ্রপাতে যে নাটকীয় দুর্ঘটনায় জগদীশের প্রেমের সমাধি সে ঘটনা যতই অসাধারণ হোক, একেবারে ধারে দাঁড়িয়েছিল বলেই জগদীশের আকস্মিক আবির্ভাবে শুধু এক পা পিছোতে গিয়ে ভীরু চিত্রা চারশো ফিট নীচে আছড়ে পড়েছিল বলেই ঘটনাটা উদ্ভট অঘটন নয়। এ তো শুধু প্রতীক ঘটনা।

ভাঙ্গা চোরা বাড়ীর রেলিং-হীন ছাতে দম ছাড়তে গিয়ে ছাতের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখার সময় মুখ ফিরিয়ে আচমকা মাতাল গুণ্ডা প্রিয়তমকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয়ে একপা পিছিয়ে যেতে চেয়ে নীচে আছড়ে পড়ে মৃত্যুতে মিলিয়ে যাওয়াও তো একই ঘটনা।

জগদীশ ছিল শিক্ষিত মার্জিত মাতাল গুণ্ডা। তার অতীত জীবনকে ঘৃণা করেও তাকে ভয় করেও চিত্রা যে তাকে ভাল-বেসেছিল সে দোষ চিত্রার নয়। এইভাবে ভালবাসতেই তাকে শেখানো হয়েছিল মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে। যে শেখানো ভালবাসার আদি-অন্ত ব্যাখ্যা করতে ফ্রয়েড থেকে তথাকথিত কত বড় বড় পণ্ডিত হিমসিম খেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

পরদিন সকালেও পাখীর কিচির মিচির ডাকেই প্রবোধের ঘুম ভাঙ্গে।

কিন্তু আজ আর তার মনে হয় না যে জীবনে এই প্রথমবার পাখীর ডাকে সে জাগল।

জগদীশ অচেতন হয়ে চাটাই-শয্যায় তারই পাশে পড়ে আছে। লুকিয়ে খায় নি। তারই সামনে তৈরী করেছিল অচেতন হয়ে ঘুমানোর দাওয়াইটা।

দেশী বিলাতী মদ, মহুয়া এবং তারই সঙ্গে আপিং!

ঘুমানোর এই দাওয়াই বানিয়ে খাওয়ার আগেই সে সুরু করেছিল আত্মাকে ধোঁয়ায় মিলিয়ে মিশিয়ে কাবু করার প্রক্রিয়া। গড়গড়া লাগেনি। হুঁকো লাগেনি। শুধু পুরাণো একটুকরা গামছার ন্যাকড়া। কলকের তলায় লাগিয়ে দু'বার তিনবার বুক ভরে প্রাণভরে টান দিয়ে সমাপ্ত করা।

ছা-পোষা মানুষ প্রবোধ। তার কাছে জীবন আর জগতের মানে বৌ আর ছেলেপিলেদের পুষে বাঁচার লড়াই মরিয়া হয়ে চালিয়ে যাওয়া।

চোখ কপালে তুলে সে বলে, মদ গাঁজা আপিম একসঙ্গে চালাচ্ছিস?

অত্যধিক জীবন্ত অত্যধিক প্রাণবন্ত জগদীশ এতক্ষণে এবার প্রথম মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, ব্যথা অনেকরকম। অনেকরকম ওষুধ দরকার।

ঃ আমিও একটু ওষুধ খাই তবে। আমার ব্যথাও কম নয়। তোর জন্য পোষ্টাপিসে জমানো কটা টাকা তুলে এনেছি বলে শুধু বাপান্ত করতে বাকী রেখেছিল।

প্রবোধ বিলাতী মদের বোতলটা তুলে জগদীশের বিক্ষিপ্ত নেশা মেশানোর কাঁচের খালি গেলাসটাতেই অনেকখানি ঢালে।

চুমুক দেবার আগে বলে, এ ওষুধে ব্যথা সত্যি কমবে তো?

জগদীশ তার গেলাস-ধরা হাত চেপে ধরে।

ঃ রাগের বশে ঝোঁকের বশে অভিমান করে এসব খেতে নেই ভাই। সামলাতে পারবি না। আমি কি রকম মনের জোর খাটিয়ে ব্যথাটা সওয়ার মত করার জন্য আস্তে আস্তে নেশাটা রপ্ত করেছি তুই ধারণাও করতে পারবি না। দেখলি না যোগী ঋষির মত কি রকম আমায় ভয় করে? যা বলি তাই শোনে?

কিন্তু প্রবোধেরও আজ একটা অদ্ভুত মরিয়া ভাব জেগেছে। জগদীশের তাগিদে আপিস আর ভাড়াটে বাড়ীর ধরা-বাঁধা জীবন থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে কদিনের জন্য—আজ মনে হয় তার নিজের তাগিদও কি কম ছিল?

জগদীশের তাগিদ পৌঁছান মাত্র এই সুযোগে দু'চার দিনের জন্য মুক্তি পাবার লোভে তার মনও কি কম চঞ্চল হয়ে উঠেছিল?

এ হিসাবও সে কি কষেনি যে এমনি তার একা কোথাও বেরোনো অসম্ভব, রেবা আর ছেলেমেয়েদের কাছে নিজেকে অতখানি স্বার্থপর প্রতিপন্ন করার সাহস তার নেই।

একা একা দু'চারদিন বেড়িয়ে আসার দাম দিতে আর সুদ কষতে বাধ্য করে ওরাই তাকে নাজেহাল করে ছাড়বে।

কিন্তু জগদীশের ব্যাপার রেবা জানে। জগদীশের জরুরী আহ্বানে একা বেরিয়ে পড়তে চাইলে ওরা কিছু মনে করতে পারবে না।

সেভিংশ ব্যাঙ্কে জমানো সামান্য কটা টাকা তুলেছে টের পেয়েই কী কাণ্ড রেবা জুড়েছিল!

ঃ দেখিনা খেয়ে। তুই তিন চার রকম মিশিয়ে খাচ্ছিস, তোর সয়ে যায়, কাজে লাগে, আমি কি মানুষ নই? দেখিনা এক রকম খেয়ে কি হয়। মরি তো নয় মরব!

বিলাতী বোতল থেকে নিজেই মদ ঢেলেছিল গেলাসে। জীবনে কখনো মদ খায়নি, তামাক সিগারেট টানে নি। সর্দি হলে দু এক টিপ নস্য নিয়েছে।

জগদীশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক চুমুকে সে গেলাসের মদটা গিলে ফেলে।

গিলতে কষ্ট হয়। গেলার পরেও এমন ভয়ানক কষ্ট হয় যে তার চিরদিনের আয়ত্ত করা রাগ পর্যন্ত যেন বিগড়ে যেতে চায়।

জগদীশের গালে একটা চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়!

জগদীশের অভ্যস্ত নেশার মর্ম বুঝতে খাবি খেতে খেতে বিলাতী বোতলের নেশাটুকু শুধু খানিকটা দুঃসাহসী পাল্লা দেবার বাহাদুরী দেখাতে গিলে; ফেলে প্রবোধ দু'চার মিনিটের জন্য চুপ হয়ে যায়।

মাথা ঘুরতে আরম্ভ করলে চুপ না হয়ে উপায় কি!

জগদীশ বলে, ভাই, বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। তুই

বিয়ে করা বৌ নিয়ে বাঁচিস। কোন ঝন্‌ঝাট নেই। তুই যা বলিস যা করিস তাই সই। তুই হলি কর্তা। বৌ ছেলেমেয়ে ঝি চাকরের মত তোর কথায় ওঠে বসে। তুই কি বুঝবি ভাই আমার প্রাণের জ্বালা? তুই কি বুঝবি কেন আমি চিত্রাকে চিরজীবনের সাথী করে নিতে চেয়েও যাচাই করে দেখতে গিয়েছিলাম, সে আমার চিরজীবনের সাথী হবার মত মেয়ে কিনা। ভুল করেই গিয়েছিলাম সত্যি কিন্তু চিত্রাই বা আমাকে এমন ভুল বুঝবে কেন, নিজে ভুল করবে কেন? চিত্রাও তো দিনের পর দিন আমায় যাচাই করছিল! আমার ভালবাসা ধোপে টিকবে কিনা, দু'দিন পরে তাকে চেবানো আখের ছোবড়ার মত ত্যাগ করব কিনা, বুঝতে চাইছিল।

মাথা ঘোরা থেমে গিয়ে কষ্টবোধ কেটে গিয়ে নিজেকে প্রবোধের তখন অদ্ভুত রকম তাজা মনে হচ্ছিল।

তার মত বুদ্ধি আর বোধ শক্তি এজগতে কারো আছে সে ভাবতেও পারছিল না।

ঃ তোকে ভালবেসেছিল বলেই যাচাই করতে চেয়েছিল।

ঃ সেটাই তো মস্ত ভুল। ভালবাসব—তবু যাচাই করব, এ ইয়ার্কি চলে না। ভালবাসা খেলার ব্যাপার নয়। দুপক্ষের যাচাই করা আগেই হয়ে যায়, নইলে ভালবাসা জন্মে না। ভালবাসা জন্মাবার পর আর কি যাচাই করা চলে কিসে কি হবে? সন্তান জন্মাবার পর মা বাবার কি হিসাব করা চলে বাচ্চাটাকে রাখব না ফেলে দেব? কাণা হোক খোঁড়া

হোক, সারাজীবন জ্বালিয়ে মারবে বোঝা যাক—তবু সন্তানকে মানতেই হবে।
অনভ্যস্ত নেশার আকাশে উঠে না গেলে প্রবোধ টের পেত, এ জগদীশ তার ছেলেবেলা থেকে চেনা জগদীশ নয়!

গোটাচারেক সিদ্ধ করা মুর্গীর ডিম দিয়ে যায় সেই মেয়েটা। জগদীশ যেন পিতার মতই উদারভাবে তার গালটা টিপে দেয়। ক্রমে ক্রমে জগদীশের ব্যক্তিত্ব যেন বনের ধারের এই নির্জন কুটিরে বসে মানস প্রসারিত করে আয়ত্ত করছিল জীবন আর জগৎ—যেন তারই নির্দ্দেশে তারই নিয়মে তারই পরামর্শে জগৎ আর জীবন চলে, জীবনের মানে যেন সেই শুধু জানে।
মরিয়া হয়ে প্রবোধ বিলাতী বোতলটা আরেকবার একটুখানি কাত করে তার গেলাসে। অল্পই ঢালে—এত অল্প ঢালে যে জগদীশের আমোদ পাওয়া নীরব হাসি তার মুখেও হাসি ফুটিয়ে তোলে।
বোতলটা টেনে নিয়ে গলায় কাত করে জগদীশ আবার হাসে বলে, আসল ভুলটা আমাদের তুজনেরি হয়েছিল এক—ভালবাসাকে না মেনে যাচাই করতে চাওয়া। আমি আরেকটা মারাত্মক ভুল করেছিলাম। সেটা আমার দোষ। সেইজন্যই তো নিজের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। আর বাঁচতে ভাল লাগে না।
অনভ্যস্ত নেশা তীক্ষ্ণ করে দিয়েছে প্রবোধের বুদ্ধি, একেবারে

চাঁছাছোলা বুদ্ধি করে দিয়েছে কিছুক্ষণের জন্য। সে ভাবে, এ তো ভারি সমস্যার কথা হল।

বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে বলে, আর বাঁচতে ভাল লাগে না বলে জগদীশ এরকম নেশা করে—অথবা এরকম নেশা করে বলেই তার জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে, বাঁচতে আর ভাল লাগে না?

সে কিছু বলবে ভেবেছিল জগদীশ। কথা না বলে সে ভাবতে সুরু করায় জগদীশ বিরক্ত হয়ে ওঠে!

প্রবোধ নিশ্চয় নিজের সমস্যার কথা ভাবছে।

তার বৌ ছেলেমেয়ের কথা।

কিন্তু বিরক্ত হয়ে রাগ করে লাভ নেই!

এই প্রবোধকেই তাকে বলতে হবে তার প্রাণের কথা।

স্থানীয় যে ক'জন অসভ্য আদিম মেয়েপুরুষ তাকে যোগী ঋষির সম্মান দেয় তাদের এসব কথা শোনানও অর্থহীন।

তারা অর্থই বুঝবে না তার কথার।

চোলাই আর মহুয়া বেশীমাত্রায় চড়িয়েছে ভেবে দুদিন চোলাই আর মহুয়ার বদলে শুধু দুধ আর ফল দেবে, ডিম আর আতা পেয়ারা ফল দেবে!

তৃতীয় অধ্যায়

কী দ্রুত গতিতেই যে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে সাধু-বাবা জগদীশের নাম। জগদীশ নামটা নয়। সাধুবাবা নাম। যোয়ান বয়স, এমন টকটকে গায়ের রং। মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায় রুক্ষতাটা গায়ের জোরে টেনে আনা হয়েছে, বোধ হয় তার যোগ সাধনার প্রক্রিয়া দিয়েই।

ছাই-চাপা আগুনের মতই তার মুখে উঁকি ঝুঁকি মারে রাজপুত্রের রূপ।

নেশা আর উচ্ছৃঙ্খলতায় এত বাড়াবাড়ি এতকাল ধরে চালিয়ে এসেও একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে পারেনি বহু পুরুষ ধরে গড়া তার দেহের বুনীয়াদী বনেদ।

তার বাপের বেলা পর্য্যন্ত চলে এসেছে শুদ্ধ স্বাত্বিক কঠোর নিয়মতান্ত্রিক আত্ম-অপচয়—মদ বেশ্যা বাইজী পার্ষদ তারা বরাবর কণ্ট্রোল করে এসেছে শাস্ত্রীয় সংযমে।

শোষণটা ঠিক রাখার জন্যই এই সংযম।

শোষণের এই সংযমী গরিয়সীতাই কত শতাব্দী ধরে ভাবুক শান্ত সাধারণ শোষিতকে মোহিত দমিত আর ভীরু কাপুরুষ করে রেখে এসেছে।

জগদীশ ভুলে যায় নি।

একটা শোচনীয় দুর্ঘটনায় চিত্রা জলপ্রপাতে আছড়ে পড়ে তলিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে বলেই কি আর নিজের অতীত জীবনকে জগদীশ ভুলতে পারে ?

মাকে জড়িয়ে ধরে শুতো জগদীশ। মাও তাকে জড়িয়ে ধরে শুতো।

রাত একটা দুটোয় বাবা বাড়ী ফিরলে মা কিন্তু কত যত্নে কত সন্তর্পণে মা ও ছেলে তাদের দুজনের জড়াজড়ি করে ঘুমানোতে ছেদ টেনে উঠে যেত।

মা ভাবত, তার বুঝি ঘুমই ভাঙ্গেনি।

মা-র জন্য তাকে করতে হত ঘুম ভেঙ্গেও ঘুমিয়ে থাকার ভাণ।

ঘুমের ভাণ করা মাথাটা রাগে দুঃখে অপমানে জ্বলে যেত জগদীশের।

মা জিজ্ঞাসাও করত না ঃ বেশ্যা পর্য্যদ বাইজীদের জন্য ফিরতে রাত হল কি ?

মা শুধু বলত, কিছু খাবে কি ? মাছ মাংস ডিম পরোটা সব তৈরী আছে।

ঃ মাছ খাব। কি মাছ আছে ?

ঃ খাণ্ডা আছে, ইলিস আছে গলদা চিংড়ি আছে। ঝাল আর

ঝোল দু'রকমই আছে। আর তুমি যে পুঁটিমাছকটা ধরেছিলে, সেগুলো ভাজা করা আছে।

ঃ জগুকে দাওনি পুঁটি ক'টা? ওর ছিপে ধরা মাছ! এক একটা মাছ তুলি, ওর কি ফুর্তি! ওকে না দিয়ে মাছগুলি আমার জন্য রেখে দিয়েছ? ছি ছি!

ঃ আমি কি জানি? বললে ওকেই দিতাম। পরশু এইটুকু একটা মিরগেল ধরেছিলে. কাঁটায় ভর্তি। তিনরকমের ভাল মাছ রাঁধা হয়েছে, কাঁটা ভর্তি ওইটুকু মাছ তুমি কি আর খাবে ভেবে—

ঃ ওইটুকু মাছ? আধসেরের চেয়ে ছোট মাছ তুললে সে মাছ আমি আনি? জলে ছুঁড়ে ফেলে দি।

ঃ আধসেরি মাছ মস্ত মাছ! তাও আবার মিরগেল। কাঁটা বাছতে বাছতে পিত্তি পড়ে খিদে নষ্ট হয়ে যায়। কাণুর মা প্রসাদ দিতে এসেছিল, মাছটা আমি তাই ওকে দিয়ে দিলাম, পুঁটি মৌরল্লা ছাড়া বেচারার একটু মাছ জোটে না। রাতে বাড়ী ফিরে তুমি একঘণ্টার বেশী আমায় বকলে।

ঃ বকলাম? মিছে কথা বোল না। আমি শুধু তোমায় বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম নিজের ধরা মাছের কাছে কোন মাছ লাগে না। জগাকে পুঁটিগুলো দিলেনা, ভাল ভাল দামী দামী মাছ দিয়েছ বলেই কি ওর মনে কম কষ্ট হয়েছে ভেবেছ? ওর ছোট ছিপে ধরা মাছ, নিজে পাঁচ ছ'টা তুলেছিল। পুঁটি তোলার কায়দা তো বেচারা জানে না, হঠাৎ একটা তুলতে

পারে তো দশটা ফস্‌কে যায়। কি রকম আকুল হয়ে ও আমাকে ওর ছিপে মাছ ধরতে বলেছিল জানো? সেই মাছ তুমি ওকে খেতে দিলে না! সোজা কথা বুঝবে না, বুঝিয়ে দিতে গেলে ভাববে বকছি!

ঃ বকছই তো। কালও বকেছিলে, আজও বকছ।

ঃ কাল একটা কড়া কথা বলেছিলাম তোমায়? আজ একটা কড়া কথা বলেছি? জগার মনে কষ্ট দিয়েছ তবু একবার তোমায় আমি গলা চড়িয়ে একটা কথা বলেছি?

ঃ ওকেই বকা বলে—গলা চড়াতে হয় না, গাল দিতে হয় না। রাত দুপুরে একটা সোজা কথা বোঝাতে একঘণ্টা লেকচার ঝাড়লে সেটা বকাবকি গালাগালির বেহদ্দ হয়। কাল বোঝালে একরকম—নিজের ধরা মাছের কাছে কি অন্য মাছ! জগা পুঁটি খাবার আবদার ধরল—তোমার উচিত কথার লেকচার শুনবার ভয়ে আমি ওকে দু'চারটের বেশী দিতে বারণ করলাম। মাছ মাংস ডিম কত রকমের রাঁধা আছে—রাত দুপুরে বাড়ি ফিরে তুমি হয় তো নিজের ধরা ওই পুঁটির শোকে তিন ঘণ্টা লেকচার ঝাড়বে। বাড়ীর রাঁধুনীর সামনেই অপমানের এক শেষ করবে। সেই লেকচার ঝাড়ছ—জগাকে পুঁটি দিই নি বলে! রাত দুপুরে এক ঘণ্টা ধরে না বুঝিয়ে বেরোবার আগে দুটো কথা বলে গেলেই হত—পুঁটিগুলো জগাকে দিও! ঃ আমি কথা কইলে তুমি বিরক্ত হও বুঝি? আমার সঙ্গে কথা বলতেও তোমার ইচ্ছা করে না?

ঃ যতক্ষণ তোমার ঘুম না আসে, যতক্ষণ কথা বলো—ঘুমে মরে গেলেও কথা কই না ? কথা থামিয়ে নিজে ঘুমোবার আগে কোনদিন ঘুমোতে দেখেছ আমায় ? ত্বপুর রাতে কথা কয়ে কয়ে বকুনি সয়ে সয়ে তোমায় ঘুম পাড়িয়ে তবে আমার ঘুমোনোর ছুটি মেলে।

ঃ ডাকাতগুণ্ডা প্রজাগুলোকে ঠেকিয়ে বিষয় সম্পত্তি বজায় রাখা, এদিকে কর্তাদের মন রাখা আর ওদিকে যারা প্রজা ক্ষেপিয়ে কর্তাদের ঘায়েল করতে চাইছে তাদের সামলে চলা—এ বুঝি মেয়েলি কাজ ভেবেছ তুমি ? এ কাজে হাঙ্গামা নেই, খাটুনি নেই ? দিনকাল বদলায় নি ? অন্যের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বাবার মত ডাঁট হয়ে মদ খেয়ে সব বজায় রাখতে পারছি ভাবছ বুঝি ? দায়টা ঘাড়ে নিয়ে তুমিই চালাও না এবার থেকে। আমি রেহাই পাই।

ঃ তোমার দায় নেওয়ার মানে জানি। মেয়েমানুষ বলেই অত বোকা ভেবো না আমায়। তোমাদের তো একটা বংশের জমিদারী। বাপ দিয়ে গেল ছেলেকে, ছেলে সব খুইয়ে শেষ করে দিল। আমার ঠাকুদারা তিন সরিক হয়েছিল, আজও তারা দায় সামলাচ্ছে। আমার মামারা পাঁচ সরিক হয়ে এখনো—

ঃ তোমার মামারা জোতদার।

ঃ তুমিই বা কদিন আর জমিদার থাকবে ? রামলালজীর দেনাটাই শুধতে পারছ না জমিদারী চালিয়ে। চাইতে চাইতে

ঘেন্না ধরে গেল, নয়া ফ্যাসনের সাতনরী হার একটা দিতে পারলে না আজ পর্য্যন্ত। ললিতবাবুর বৌকে চাইতে হয় নি— নিজেই দিয়েছে।

ঃ তোমার খালি নালিশ আর নালিশ। আমি আজ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম জানো ?

ঃ ওমা, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ? কোথায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ? কেন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ? কী সর্বনাশের কথা ! এতক্ষণ বলনি আমায় ? তুমি বরং শুয়ে পড়. খেয়ে কাজ নেই। পাংখাটা বন্ধ করে দিতে বলি, কেমন ? ছোঁড়াটার নাকি পাংখা টেনে টেনে বুকে কিরকম একটা ঘা হয়েছে—খালি কাসে আর রক্ত তোলে। ওর মা এসে আজ পাংখা টানছে। আমার সন্দেহ হয়েছিল, আমি বুঝেছিলাম ওর ছেলেটার নিশ্চয় যক্ষ্মা হয়েছে। আমি কিন্তু ওদের কথা দিয়েছি, বাবু সব ঠিক করে দেবে। ওর মা তাই ছেলের হয়ে পাংখা টানতে এসেছে। কি বলব বল তো ওকে ? না না, তোমায় উঠতে হবে না, তোমায় কিছু করতে হবে না ! আমায় শুধু এক কথা বলে দাও কি করতে হবে।. ওকে ছুটি দিয়ে দি ? কি বিশ্রী লাগছে পাংখার হাওয়া। এ হাওয়ায় তোমার ঘুম আসবে না। পাংখা টানা বন্ধ করে বেচারাকে ঘরে যেতে বলছি ! যতক্ষণ না ঘুমোও হাত পাখা দিয়ে মাথায় হাওয়া করব।

এই কথার নাটকের মধ্যে কখন কোন সময় ঘুমিয়ে পড়ত জগদীশ তার নিজেরই খেয়াল থাকত না।

কথাগুলি অবিকল মনে নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কথা কাটাকাটির মোট মানে আর ধরণটা শুধু মনে আছে।

ভদ্রভাবে শান্তভাবে তাদের দীর্ঘ কলহের পালা চলত। অল্পবিস্তর মদ খেয়ে বাড়ী ফিরেও ধূর্জটি কোনদিন মন্দাকিনীকে গলা চড়িয়ে একটা ধমক দিয়েছিল কিনা জগদীশ স্মরণ করতে পারে না।

মন্দাকিনীর জন্য গভীর মমতা ছিল ধূর্জটির। তার মধ্যে ফাঁকি ছিল না—সে দরদ ছিল আন্তরিক। অজস্র অসংখ্য খুঁটিনাটি প্রমাণে এ সত্য সন্দেহাতীত হয়ে আছে।

প্রথম বয়সে, সংসারের হাল চাল বুঝে উঠতে আরম্ভ করার সময়, মাঝে মাঝে দু'এক পেগ মদ খেতে সুরু করার সময়, জগদীশ ভেবেছিল, মার জন্য তার বাবার ওই মমতাই তাকে অসংযত হতে দিত না।

ঠাট বাজায় রাখতে হত। পার্ষদ নিয়ে মদ্য পানও চলত, বাইজীও নাচত। কিন্তু ধূর্জটি কোনদিন বেহুঁশ অভদ্র মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরত না।

ক্রমে ক্রমে টের পেয়েছিল ধূর্জটির ওই সংযমের কারণ ছিল মন্দাকিনীর জন্য তার মমতা নয়, ভয়।

মন্দাকিনীর ভাইদের কাছে, জগদীশের মামাদের কাছে, তার ঋণ জমেছিল পাহাড়ের সমান, প্রয়োজন ছিল আরও ঋণের। মন্দাকিনীকে চটাতে সে সাহস পেত না।

টানটা ছিল খাঁটি।

বোধ হয় সেই জন্যই ওরকম ভদ্রভাবে মার্জিতভাবে মাঝরাত্রে একটানা উপদেশ ঝেড়ে শান্তি দেবার, গায়ের জ্বালা জুড়োবার প্রয়োজন হত।

মমতা আছে কিন্তু ভয় করতে হয়। একদিন মাতলামি করলে অসভ্যতা করলে মন্দাকিনী সোজা ভাইদের কাছে নয় মামাদের কাছে চলে যাবে।

তাই দরকার ছিল সংযমের।

সেও কি চিত্রাকে ভয় করত বলেই জীবনে প্রথম অনুভব করেছিল সংযমের প্রয়োজন? তার অসংযমকে চিত্রা কোন মতে স্বীকার করবে না জেনে সে সংযত হয়েছিল?

অতীতে সে যা-ই করে থাক সেটুকু মার্জনা করতে চিত্রা রাজী ছিল কিন্তু বাকী জীবনটা সে একান্তভাবে শুধু তারই অনুগত হয়ে থাকবে চিত্রার মধ্যে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জাগাতে না পারলে তাকে পাওয়ার কোন আশা ছিল না বলেই কি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে চিত্রা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে?

সেদিন জানা ছিল না জগদীশের।

সন্ন্যাসী না হতে চেয়েও, শুধুমাত্র চিত্রার জন্য নিজের ব্যথার পূজাটা প্রচণ্ড আত্মনিগ্রহের প্রক্রিয়ায় চালিয়ে গিয়ে নিজেকে

শেষ করে ফেলার উপায় অবলম্বন করলেও এভাবে আত্মহত্যা সম্ভব করতে পারে নি—বরং চড়া নেশার কড়া ওষুধে আত্ম-বিস্মৃতির সাময়িক বিশ্রামটুকু পেয়ে পেয়েই আত্মা তার আত্ম-রক্ষা করে ফেলতে পেরেছে।

ব্যথার পূজা? আত্মহত্যা?

অথবা আত্মরক্ষা?

চিত্রা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সত্যই কিন্তু জীবনটা বদলে ফেলার প্রয়োজনেই তারও কি চিত্রাকে ভালবাসার প্রয়োজন হয়েছিল?

ওই জীবন আর টানতে পারছিল না, একদিন এক মুহূর্তের ঝোঁকে চিত্রাকে বুকে চেপে ধরার মতই সহজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিনা কষ্টে মরণকে বরণ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল—এই নির্জনে পালিয়ে এসে তাই বাঁচার চেষ্টা?

প্রত্যেকদিন বিষ খেয়ে বেহুঁশ হয়। কিন্তু একান্তে বসে চিন্তা করার তো বিরাম ঘটে নি।

জীবন ও জগতকে বুঝবার চেষ্টার বিরাম!

আগেই বরং আসল চিন্তার সময় জুটত না, সব সময় ব্যস্ত হয়ে থাকত খুঁটিনাটি ঝনঝাটের চিন্তায়। এখানে সে সব বালাই নেই। নেশা করে এক ঘুম দিয়ে উঠে কাজ। শুধু কি ও কেন চিন্তা করা, আসল কথাটা ধরবার চেষ্টা করা।

ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সাধু হিসাবে বেশী বেশী নাম

ছড়ানো জগদীশকে বিস্মিত করে, একটু শঙ্কাও জাগায়।
কী পরিনতি হবে তাকে সাধক মহাপুরুষ করে তোলার এই প্রক্রিয়ার যার গতিরোধ করার সাধ্য তারও নেই, একমাত্র পালিয়ে যাওয়া ছাড়া।

তিনদিকে ঘিরে আছে আদিম অসভ্য মানুষের গাঁ, তারাই সবচেয়ে বেশী কাছাকাছি।

তারা জগদীশকে ভয় করে, ভক্তি করে। কিন্তু তারাই শুধু নয়। অন্য মানুষও কৌতূহল মেটাতে আর ভক্তি জানাতে আসে দূরের গ্রাম আর সহর থেকে।

গ্রাম থেকে আসে চাষাভুষো মানুষ, তারা বড়ই গরীব আর বড়ই অজ্ঞ। অক্ষর জ্ঞান আছে, রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারে, এরকম লোক গ্রাম থেকে আসে খুব কম।

গ্রামের চেয়ে বেশী ভক্ত আসে খোদ সহর থেকে।

শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মানুষ।

নানাকরকম অর্ঘ ও উপাচার নিয়ে আসে—টাকা পয়সা প্রণামী দিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায়।

জগদীশ বলে, টাকা পায়ে ছুঁইয়ো না। ওই মাটির হাঁড়িটাতে ফেলে দাও।

উপদেশ চায়। আশীর্ব্বাদ চায়। পরিত্রাণ চায়। অর্থে-আনন্দে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ চায়।

জীবনে কত যে ব্যর্থতা আর কত যে ঝন্‌ঝাট মানুষের। কত যে সমস্যা আর কত যে বিপদ।

শান্ত নির্বিকার আত্মস্থ জগদীশকে দেখে মনে হয় না যে সে ব্যাকুল কাতর কণ্ঠের আবেদন নিবেদন শুনছে। রোগশোক দুঃখ-বেদনা, শোকতাপে জর্জরিত সাধারণ মানুষের মর্মন্তুদ কাহিনীই হোক আর হাজারপতির লাখপতি হবার চেষ্টা বার বার বিফল হবার কাহিনীই হোক—সে যেন সমান নির্বিকল্প-ভাবে শোনে।

দুঃখী মানুষকে করুণা করাও মানস সাধনার অঙ্গ। আত্মা যেন তার ডুবে আছে ধ্যানে সাধনায়।

চেতনার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র সে যেন কাজে লাগিয়েছে বিব্রত মানুষের কথা শুনে উপদেশ দেবার জন্য।

তাই যদি না হবে, তবে নিমীলিত চোখে এভাবে নিথর নিষ্কম্প হয়ে যোগসাধনায় ডুবে থেকেও কি করে সে প্রত্যেকের কথা শোনে, প্রশ্নের জবাব দেয়, উপদেশ দেয় আর অন্যায় আবদার করলে তিরস্কারে মাথা নুইয়ে দেয়?

সত্যই তো। একটা কিছু পেয়ে না থাকলে রাজার মত ধনীর ছেলে এই বয়সে এই জংগলে জংলী মানুষের সঙ্গে অকারণেই কি ডেরা বেঁধেছে!

রবিবার সকাল থেকে ভক্ত সমাগম সুরু হয়।

রবিবার সহরের ভদ্র ভক্তের সমাবেশই হয় বেশী।

ছুড়ি বেড়ানো হবে। যুবক সাধক ও মহাজ্ঞানী সাধুকে প্রণাম করাও হবে।

এক রবিবারের ভোরে সপরিবারে আসে প্রতাপ।

কী বিরাট পরিবার !

চার ছেলে। বড় তিন ছেলের তেইশটি ছেলে মেয়ে। সাতটি নাতিনাতনী। বাচ্চা কাচ্চা সমেত আশ্রিত আত্মীয় আত্মীয়ার সংখ্যা এগার।

জলপ্রপাত না দেখে এরা অবশ্য ফিরে যাবে না। তবু মনে হয়, বাঙালী যুবক সাধুবাবাকে প্রণাম জানাতেই যেন তারা এসেছে, হুড্রু জলপ্রপাতটা দেখা কলা বেচে যাওয়ার মতই আনুসঙ্গিক ব্যাপার।

সত্তর পেরিয়েছে প্রতাপের বয়স।

ভ্রূ পর্য্যন্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু টের পাওয়া যায় আজও প্রতাপ বিষয়বুদ্ধি কর্মশক্তি আর সমগ্র পরিবারটির উপর প্রতাপ হারায় নি।

সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতাপ কাঁধের উড়ানীটা গলায় জড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানায় জগদীশকে। সোনার একটা মোহর অর্থাৎ সেকালের একটা গিনি তার পায়ে ছুঁইয়ে প্রণাম করে।

জগদীশ শান্ত কণ্ঠে বলে, গিনিটা ওই মাটির ভাঁড়ে ফেলে দাও। কেন যে তোমরা আমায় টাকা পয়সা দিয়ে প্রণাম করতে আস !

প্রতাপ গদগদ ভাষায় বলে, আপনি আমার শেষ সাধু, শেষ গুরু। আর কারো কাছে যাব না। আপনার উপদেশ শুনে যদি বুঝি উপায় নেই—ভেঙ্গে চুরমার করে দেব সংসারটা।

আমি মারা গেলে সাথে সাথে চুরমার তো হয়ে যাবেই। উপায় নেই বলে আমার খাতিরে কোনমতে একসাথে আছে। কী অশান্তি, ওরে বাবা, আমার কী অশান্তি!

কপাল চাপড়াতে গিয়ে প্রতাপ ভোরে কেটে আসা কপালের চন্দনের দাগগুলিতে ভাঙ্গন ধরিয়ে দেয়।

ঃ টানতে আর পারিনে বাবা। আছে তো মোটে তিনশো বিঘে জমি, গোটা চারেক বাড়ী আর আশী নব্বুই হাজার নগদ টাকা। কারবারটা টানাছ বলে কোন মতে ঠেকিয়ে যাচ্ছি। রোজগেরে ছেলেগুলো পর্য্যন্ত ছিনে জোঁকের মত সেঁটে রয়েছে—ভাগটা না মারা যায়। কী অশান্তি, কী অশান্তি!

মুখ ফিরিয়ে একবার সে তাকিয়ে নেয় তার বিরাট বংশের যে মস্ত অংশটা আজ এখানে উপস্থিত আছে।

ঃ কোটিপতির ছেলে তুমি, পার্থিব সুখ ছেড়ে যোগী সন্ন্যাসী হয়েছ। তোমার বাবাও ছিলেন মহাপুরুষ, কত হাজার টাকা আমায় পাইয়ে দিয়েছিলেন ঠিক ঠিকানা নেই। দেশ বিদেশের জ্ঞান কুড়িয়ে এই বয়সে সংসার ছেড়ে সাধক হয়েছ। আমার অশান্তি কিসে ঘোচে আমায় বলে দিতে হবে বাবা!

তবু জগদীশ মুখ খোলে না, তেমনি নির্বিকার শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। গিনিটা প্রতাপের হাতে ধরা ছিল, হাত বাড়িয়ে সেটা সে জগদীশের সামনে মাটিতে রাখে।

এবার জগদীশ মুখ খোলে।

ঃ তোমার প্রণামী তো আমি নেব না।

ঃ কেন বাবা, কি অপরাধ হল ?

ঃ প্রণামীর জন্য তুমি সোনা এনেছ! জান না প্রণামী দিয়ে আমি কি করি? হাভাতে হাঘরে গরীবদের বিলিয়ে দিই।

প্রতাপ কাতরভাবে বলে, কিন্তু সোণা দিলে কি দোষ হয় সেটা তো ঠিক—

ঃ কাকে দেব সোনাটা? সোনাটা ভাঙ্গাতে গেলে গরীব বেচারাকে চোর বলে পুলিশে ধরবে না? কটা ছাপা কাগজ আনলেই হত, কজনকে দিতে পারতাম!

প্রতাপ হাত জোড় করে বলে, তাই নিন দয়া করে—সোনাটাও থাক। এটা বংশের নিয়ম, গুরুকে সাধুকে ব্রাহ্মণকে সোনা ছাড়া প্রণাম করলে অভিশাপ লাগবে।

নিয়মটা নাকি চালু করে গিয়েছে প্রতাপের পিতাঠাকুর। যা ধরত তাই সোনা হয়ে যেত, গুরু তাই হুকুম দিয়েছিল টাকা পয়সা শুধু ভিক্ষা দেওয়া চলবে—গুরুকে সাধুকে ব্রাহ্মণকে বা মন্দিরে সোনা ঠেকিয়ে প্রণাম না করলে হয়ে যাবে সর্ব্বনাশ।

প্রতাপ ডাক দেয়, খুব মিষ্টি সুরে ডাক দেয়—ছোট বৌমা, পাঁচ টাকার নোট দাও দিকি পাঁচখানা।

রঙচঙে শাড়ী আর একরাশি গয়নায় জমকালো করে সাজা বিশ থেকে চল্লিশ পেরোণো বয়সের কয়েকজনের পিছনে ছিল ছোট বৌ ললিতা।

নিজেকে স্বেচ্ছায় খানিকটা আড়াল করেছিল।

সামনে এগিয়ে আসতেই তাকে দেখে জগদীশ চমকে ওঠে, কয়েক মূহূর্তের জন্য ভুলে যায় যে সে যোগী সাধক, তরুণী কোন স্ত্রীলোককে দেখে বিচলিত হওয়াটা তার একেবারেই উচিত নয়।

একটু বিহ্বল না হয়েও অবশ্য তার উপায় ছিল না।

জলপ্রপাতে হারানো চিত্রা যেন উঠে এসেছে তার সামনে। শাড়ীটা চিত্রার, চিত্রার মতই তার দু'হাতে দু'গাছা শুধু চুড়ি। গায়ের রঙে সোনার চুড়ির এমন মিল যে মনে হয় চিত্রার মতই এই কারণেই সে বুঝি অঙ্গ থেকে বিসর্জন দিয়েছে আভরণের চিহ্নটুকু।

চিত্রার ছাঁচে ঢালা গড়ন।

সেকেলে উথলানো গড়নটা যথা সম্ভব চাপা দেবার জন্য ঠিক চিত্রার মতই আধুনিকতম সাজসজ্জার কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

তবে মুখ একেবারে অন্য রকম।

তার মুখ দেখে জগদীশ স্বস্তি পায়।

চিত্রার মুখের সঙ্গে শুধু রঙের মিল ছাড়া কোন মিল নেই।

লালিত্য আছে, কোমলতা আছে, লাবণ্য আছে—কিন্তু সবই যেন আছে মুখের তীক্ষ্ণ কাঠিন্যকে খানিকটা আড়াল করে যতটুকু না রাখলে নয় শুধু ততটুকু মেয়েলি ভাব বজায় রাখার জন্য।

চোখে শান্ত সজাগ দৃষ্টি—বুদ্ধির ধারে শাণিত।

পাঁচ টাকার পাঁচটি নোট গুণতে গুণতেই ললিতা একবার শাণিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে নেয়।

তাকে ঠোঁট কামড়াতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে জগদীশ সামলে নেয়।

একটু হতভম্ব প্রতাপকে সে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এই পরম ভাগ্যবতী মা-টিকে তুমি কোথায় পেলে ?

মা-টিকে !

নোট ক'খানা হাত থেকে খসে পড়ে যায় ললিতার।

প্রতাপ মুগ্ধ কৃতার্থ গদগদ হয়ে বলে, আজ্ঞে যা বলেছেন। সব চেয়ে অমানুষ ভেবেছিলাম যে ছেলেটাকে, শেষ পর্য্যন্ত সেটাই হল মানুষ। পাট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে নিজে কখনো সাহস পাইনি—শুনেছি অনেক ফটকাবাজি চলে। ছেলেটা যেমন পাজী তেমনি চালাক চতুর। ভাবলাম ওটাকে পাটের লাইনে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখি কি হয়। কথা কি শোনে ? যত বলি, তুই পারিস না পারিস তোর কোন দায় নেই, বিশ ত্রিশ হাজার যদি যায় তো যাবে। তোকে কিছু বলব না, তুই শুধু একবার কোমর বেঁধে লাগ।

জগদীশ নির্ব্বিকার ভাব বজায় রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রতাপের কথা শোনে। মনে তোলপাড় ওঠা মুখে যাতে ফুটে না ওঠে সেজন্য রীতিমত তাকে কসরৎ করতে হয়।

ছোট ছেলের নাম আলোক। সে কিছুতে নামবে না পাটের ব্যবসায়ে, সে পড়বে। পরীক্ষা পাশ সে করে সত্যি—কোন রকমে হলেও পাশ করে।

একটি সত্যিকারের বিদ্বান ছেলে সারাজীবন চেয়ে আসছে প্রতাপ। মাথা-ওলা শিক্ষিত যে সব মানুষ চিরদিন সামনে তোষামোদ করেও মনেপ্রাণে অবজ্ঞা করে এসেছে তাকে, তাদের মত বিদ্বান একটি ছেলে চেয়েছে।

প্রথমে আশাও করেছিল যে আলোক বুঝি তার স্বপ্ন সার্থক করবে।

কিন্তু কলেজের প্রথম পরীক্ষা পাশ করেও আলোক তাকে টের পাইয়ে দিয়েছিল যে তার বিদ্বান ছেলের স্বপ্ন সার্থক করার কোন ইচ্ছাই তার নেই।

পাশ করল। সেই অজুহাতে উড়িয়ে দিল বাবার হাজার দশেক টাকা।

ভড়কে গিয়ে প্রতাপ কড়া স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার মনের ইচ্ছাটা কি?

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, আমি মানুষ হব, বড় হব। সেকেলে চালচলন আমার সয় না।

কৃতার্থ প্রতাপ বলেছিল, আমিও তো তোকে মানুষ করতে বড় করতে চাই বাবা! লাট বেলাটের সাথে তুই সমান ভাবে বড় বড় জ্ঞানের কথা বলবি, ফড় ফড় করে ইংরেজী বলবি, তাই তো আমার সাধ! তা লেখাপড়ায় মন দিয়ে তো করবি সেটা? সিগ্রেট খাচ্ছিস, খা। ওটা হয়ে গেছে মুড়ি মুড়কি, বাচ্চারাও খাচ্ছে। এ বয়সে মদ ধরেছিস কেন? কী করে তুই বড় হবি, মানুষ হবি? উচ্ছন্ন হয়ে যাবি না?

ছেলে বলেছিল, মদ ধরি নি তো? উপায় না থাকলে ওষুধ গেলার মত দু'এক চুমুক খাই। বড় হব, মানুষ হব,—স্মার্ট ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দেব—সেকেলে গেঁয়ো ভূত হয়ে থাকলে হয়?

দিন দিন ম্লেচ্ছ হয়ে যেতে লাগল ছেলে, দিন দিন যেন ধাতস্থ করতে লাগল সাহেবী মন মেজাজ।

কাজের মানুষ, অনেক দায়—একটা ছেলের বিষয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামায়, সময় কি আছে প্রতাপের? খেয়ে উঠে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আধঘণ্টা তামাক টানার অবসরটুকু ভরে রইল বিষাদ আর আপশোষে।

কিন্তু উপায় কি। যে লাইনে এগোচ্ছে, সেই লাইনেই চলতে দিতে হবে ছেলেকে।

ছেলে কিন্তু মান রেখেছে তার।

কত কাণ্ড করে বিলেত টিলেত ঘুরে দেড় হাজার টাকার চাকরী বাগিয়েছে, লাটবেলাটদের মহলে তার চলাফেরা।

আজও কিন্তু প্রতাপকে সে বাপের সম্মান দেয়, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম পর্যন্ত করে।

ললিতাকে সে বিয়ে করেছিল তাকে কিছু না জানিয়েই, রেজিষ্টারি আইনে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বাপকে সে বলেছিল স্পষ্ট করেই, ইচ্ছা হলে তোমার মতেই আবার আমাদের বিয়ে দাও না? ধরে নাও না বিয়ে আমাদের হয় নি? তুমি

চাইলে টোপর পরে বর সেজে আবার আমি ওকে বিয়ে করব। গরীব মামা ছাড়া কেউ নেই ললিতার।

অনেক ভেবে চিন্তে ছেলের বিয়েটা প্রতাপ মেনে নিয়েছিল, বৌ ভাত দিয়েছিল সমারোহ করে। আত্মীয়স্বজন-জানা চেনা যে যেখানে ছিল সকলকে আনিয়েছিল।

ভেবেছিল হাজার পাঁচ ছয়ে কুলিয়ে যাবে, খরচ হয়ে গিয়েছিল তের হাজারের উপর।

রেগে টং হয়ে গিয়েছিল বড় ছেলেরা আর তাদের বৌরা।

প্রায় বেধে গিয়েছিল একটা ভীষণ রকম গৃহযুদ্ধ। কত কষ্টে কী কৌশলে যে প্রতাপ সামলে নিয়েছিল বিপদটা।

ভেবে চিন্তে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল।

চীৎকার করে বলেছিল, আমার বুঝি কোন সখ নেই, সাধ আহ্লাদ নেই? তোমরা বাজে খেয়ালে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দেবে, একটা ছেলের বিয়েতে একটু আনন্দ করব তাও তোমাদের সয় না? কালই আমি উইল করে সব কিছু বিলিয়ে দেব। পরশু কাশী চলে যাব।

সবাই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।

তারপরে কঠিন অসুখ হয়েছিল প্রতাপের। এক মাস শয্যাগত হয়েছিল। ললিতা নিয়েছিল টাকা-পয়সা আদান-প্রদানের হিসাবনিকাশের ভার, আর তিনজন ম্যানেজারকে সামলাবার ভার। রোগ শয্যা থেকে উঠে কাজকর্ম হিসাবনিকাশ দেখতে বসে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল প্রতাপ।

একটা মাসেই তার মোট লাভের অঙ্ক হাজার পাঁচেক বাড়িয়ে দিয়েছে ললিতা।

হীরের আংটি বা দুল না সোনার হার ?

ললিতাকে কি পুরস্কার দেবে ভাবতে প্রতাপকে রীতিমত মাথা ঘামাতে হয়েছিল।

ভেবেচিন্তে ওসব সেকেলে পুরস্কারের প্রথা সে বাতিল করেছিল ললিতার মত একেলে ছেলের বৌ পাওয়ার খাতিরে।

ঘড়ি ধরে নিয়মিত সময়ে ললিতা তাকে ওষুধ খাওয়াতে আসার সময় সে কিছুই বলে নি, শুধু একটু সস্নেহ দৃষ্টিতে তার চোখে চোখে তাকিয়ে খুশির ভাব দেখিয়ে তার হাত থেকে তিতো ওষুধ নিয়ে খেয়েছিল।

পথ্য দেবার সময় বলেছিল, বৌমা, তুমি তো আমার ছেলের বাড়া। হিসেবে দেখলাম—ছেলেদের তুমি লজ্জা দিয়েছ বাছা। এই দায়টাই তোমায় আমি দিলাম। এই নাও তোমার গত মাসের মাইনে।

হীরা বা সোনার গয়নার্গাটি নয়, ব্যবসায় আসল হিসাবনিকাশ চুরিচামারির ব্যাপার দেখে শুনে মাসে তার পাঁচ হাজার টাকা লাভ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাজার টাকার চেক। এবং মাঝে মাঝে এই কাজ করার জন্য প্রত্যেকবার একটি করে চেক পাবে এই প্রতিশ্রুতি !

ললিতা কেঁদে ফেলেছিল।

ঃ এমন কি আমি করেছি যে আমায় এত বাড়ালেন বাবা ?

ঃ করেছ বৈকি। একটা ছেলেকে মানুষ করতে পারলাম না, পয়সা উপায়ের কায়দা শেখাতে পারলাম না। সবার পেছনে শুধু ব্যয়। পাঁচশো টাকা ঘরে আনবে তো উড়িয়ে দেবে হাজার টাকা। পরের মেয়ে ঘরে এসে তুমি আমার আয় বাড়িয়েছ, আমার একমাত্র রোজগেরে ছেলের ম্লেচ্ছ হয়ে যাওয়া ঠেকিয়েছ। তুমি অনেক করেছ মা!

নিজের সংসারটিকে নিয়ে হাজির হয়ে জাঁকিয়ে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতাপ নিজের সংসারের কাহিনী শোনায়, আবার নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলিও করে। তিন ঘণ্টার উপর!

অন্য ভক্তরা এসে কিছু কিছু প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে, একরকম চুপচাপ বসে আছে।

পাঁচখানা পাঁচ টাকার নোট প্রণামী দিয়েছে প্রতাপ, সপরিবারে সে যদি আসর জুড়ে থাকে একটা বেলা, নীরবে দেখা আর শোনা ছাড়া কী-ইবা করার বা বলার থাকে দু'চার আনা থেকে দু'এক টাকা প্রণামী দেনে-ওলা তাদের!

জগদীশ নীরবতা ভঙ্গ করে হঠাৎ গর্জন করে ওঠে, তুমি শান্তি পাবে না। তুমি মহাপাপী।

সকলে চমকে ওঠে। অস্ফুট কয়েকটা আওয়াজ শোনা যায় ভয়ের, তারপর শ্বাসরোধ করা নীরবতায় থম থম করতে থাকে ভক্তের আসরটা।

বুড়ো প্রতাপ শুধু চমকায় না, ভয় পেয়ে কঁকিয়েও ওঠে না। নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে সে চোখ বোজে।

অনেককাল অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সে কারবার করেছে। সে ব্যাপার জানে।

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে এবার ধীর উদাত্ত কণ্ঠে জগদীশ বলে, মানুষের চেয়ে টাকার দাম তোমার কাছে বেশী। নিজের ছেলে মেয়ে বৌ নাতি-নাতনীর সঙ্গে পর্য্যন্ত তোমার টাকার সম্পর্ক। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। তোমার কাছে টাকাই সব। ওয়েষ্টার্ণ সিভিলাইজেসনের—

জগদীশ থামে। মাঝে মাঝে সে লম্বা চওড়া ইংরাজী কথা বলে, অনায়াসে সহজভাবে প্রায় ইংরেজের মতই উচ্চারণ করে বলে। বলতে বলতে থেমে যায়।

তারপর বিদেশী কথা কটার সহজবোধ বাংলা তর্জমা করে আবার স্থরু করে তার কথা।

বলে, পশ্চিমী ম্লেচ্ছ সভ্যতায় এটাই সব চেয়ে বড় পাপ। এই পাপে তুমি ডুবে গেছ, টাকা টাকা করে আজও তুমি পাগল। লাভ বাগানোটাই তোমার কাছে সার কথা।

সহজভাবে সকলের নিশ্বাস পড়ে। সকলে স্বস্তি বোধ করে। অন্য কোন বিশ্রী মহাপাপ নয়—প্রতাপ টাকা বেশী ভালবাসে এই মহাপাপ! অনেক টাকা আছে তবু আরও অনেক অনেক টাকা চায়—এই পাপে প্রতাপ মহাপাপী!

প্রতাপ চোখ মেলে যেন খুশির সঙ্গেই বলে, কি করব তবে ? কি করলে আমার অশান্তি যাবে, সংসারটা টিকবে ?

ঃ প্রায়শ্চিত্ত কর।

ঃ কি ভাবে করব প্রায়শ্চিত্ত ?

ঃ বলে দেব, বুঝিয়ে দেব। সারাজীবন পাপ করে একদিনে কি প্রায়শ্চিত্ত হয়, রেহাই মেলে ?

জগদীশ ইঙ্গিত করে।

মোটা জঙ্গুলে কাপড় পরা কালো মেয়েটা কাঁচের বড় গেলাসে ঘন সবুজ পানীয় এনে দেয়। সবুজ না হয়ে নীল হলে হয় তো ললিতা ভাবতে পারত, জীবন-সমুদ্র মন্থন করা বিষ।

এক চুমুকে গেলাস শেষ করে জগদীশ বলে, ধীরে ধীরে বুঝবার চেষ্টা কর, মরার পরেও সংসার টিকিয়ে রাখার দায় তোমার নয়। সংসারটা ছত্রখান হয়ে যাবে বলে আসলে তোমার অশান্তি নয়—তোমার টাকাগুলো নষ্ট হবে বলে তোমার এত কষ্ট। তোমার এমন মায়া টাকার যে আজ যদি বলি আমি তোমার এ মায়া কাটিয়ে দেব—তুমি আঁতকে উঠবে !

ঃ আমি সংসারী মানুষ, পাঁচজনকে নিয়ে সংসারে থেকেই মরতে চাই বাবা—সন্ন্যাসী হতে চাই না !

জগদীশ হেসে বলে, দেখলে ? টাকার নেশা কাটবার কত ভয় তোমার ? ভয় নেই, আমি তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দিয়ে আসব।

প্রতাপ কৃতার্থ হয়ে বলে, বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন !

ঃ তোমার অশান্তি রোগটা সারাতে যাব।

ললিতা ভেবে চিন্তে জিজ্ঞাসা করে, আপনার ভোগের কি ব্যবস্থা করব?

জগদীশ হেসে বলে, আমি কি ভোগ করতে যাব? ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে না। এই প্রপাতের জল শুধু রেখো—শুধু জল খাব। এখানকার জল ছাড়া আমি খাই না জান তো?

প্রতাপের বাড়ীর মেয়েদের কাছে হুড্রুর নবীন সন্ন্যাসীর গল্প শোনে নগেনের বাড়ীর মেয়েরা।

ললিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিলাম সত্যি, একদৃষ্টে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন গিলে খাবেন! এ কেমন সাধু, মেয়ে বৌ দেখে ধাত ছেড়ে যায়? কেন ওভাবে দেখছিলেন, কথার ছলে বাবাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমাকেই শেষে লজ্জা দিলেন। আমার মধ্যে নাকি অসাধারণ কিছু আছে, তাই বিশেষভাবে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। আমার ভেতরটা দেখছিলেন!

ললিতার মুখে বেদনার ছাপ পড়ে।

অনুতপ্ত প্রাণের বেদনার ছাপ। সখেদে বলে, বাজে বদ লোকের চাউনি দেখে দেখে সত্যি আমাদের বিশ্রী ম্যানিয়া জন্মে যায়। খাঁটি যোগী সাধকের চাউনিটাও চিনতে পারি না। বাবার সঙ্গে ওঁনার কথাবার্তা শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার খেয়াল হল—আরে, কী বোকার মত আবোলতাবোল ভাবছি!

উনি তো গাঁজাখোর ভিখিরী সাধু নন। বড়লোক বাপের এক ছেলে, কত বড় বিদ্বান, বিলাতে পড়তে গিয়েছিলেন, কত বছর ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। হাই সোসাইটির কত শত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে উনি মিলেছেন মিশেছেন। সব ছেড়ে যোগ সাধনা ধরেছেন, আমার মত একজনের দিকে উনি তাকাবেন খারাপ চোখে!

সুদর্শনাও অন্য সকলের মতই অভিভূত হয়ে শুনছিল, হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে সে বলে, বড়লোকের এক ছেলের কিন্তু অনেকরকম পাগলামির রোগ জন্মায়। নানারকম উদ্ভট খেয়াল চাপে। দেশে-বিদেশে হৈ হুল্লোড় একঘেয়ে লাগল, ওভাবে আর রস মেলে না, তাই খেয়াল হল কিছুদিন যোগী সেজে মজা করা যাক।

সুদর্শনা একটু হাসে।—আমি অবশ্য দেখিনি তোমার যোগী পুরুষটিকে—খাঁটি না সখের যোগী জানি না। তবে এরকম লোক স্বাদ বদলাতে যোগীও কিন্তু সাজে। বড়লোকের সেকেলে মুখ্যু ছেলে বিগড়ে গেলে শেষ হয়ে যায়। একালের কিছুই জানে না, পাঁচজন একেলে বন্ধুর সঙ্গে একেলে উচ্ছৃঙ্খলতার মজাটা লুঠতে চায়। তলিয়ে যাবার উপক্রম ঘটলে আর কুল কিনারা পায় না—জানে না তো কিভাবে কোনটা ধরে ভরা-ডুবি সামলে নেবে। জগদীশবাবুরা একেলে ব্যাপার খানিকটা বোঝেন, সভ্য-জগতের সস্তা মজা লুটতে লুটতে কাবু হলে একেবারে ডিগবাজী খেয়ে যোগী সাধু বনে গিয়ে সামলে নিতে পারেন।

সুদর্শনার কথা সবাই শোনে। অনিচ্ছা নিয়েও বাধ্য হয়ে শোনে। তাদের সকলেই অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী—কেন যে ছিঁটি-ফোঁটা বিদ্যার স্বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাদের শুধু জব্দ করা সুদর্শনাদের কাছে।

একেবারে মুখ্যু করে রাখলে, সেকেলে করে রাখলে, তারা তবু অনায়াসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে সুদর্শনাকে থামিয়ে দিতে পারত বক্তৃতা দিতে সুরু করা মাত্র।

কী একটু বিদ্যা চাখিয়েছে, কী একটু স্বাদ দিয়েছে নতুন যুগের জীবনটায়—সুদর্শনা মাষ্টারনীর মত উপদেশ আর বক্তৃতা ঝাড়তে সুরু করলে প্রাণটা এমন তড়বড় করে যে শেষ পর্য্যন্ত না শুনে পারা যায় না।

ললিতা খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো বলিনি, তুমি কি করে জানলে ওনার নাম জগদীশ ?

সুদর্শনা হাসে না।

গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করে, রমলাকে মনে আছে ললিতাদি ? তোমাদের রাঁচির পাগলা গারদে দিদিকে দেখতে এসে তোমাদের বাড়ীতে উঠত ? তোমাদের সঙ্গে কি যেন একটা সম্পর্ক আছে, ঠিক মনে নেই। দিদির কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলত—তোমাদের ওই যোগী সাধু জগদীশবাবুর জন্যই নাকি তার দিদির ওই অবস্থা হয়েছিল, রাঁচির পাগলা গারদে আসতে হয়েছিল।

ললিতা রেগে টং হয়ে বলে, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি

না। বাবা ছ'মাস চেষ্টা করে একবার বাড়ীতে আনতে পারলেন না, সংসারের ভোগে সুখে ওঁর এমন বিতৃষ্ণা—উনি তোমার বন্ধুর দিদিকে পাগল করেছিলেন। আবোল তাবোল কথা বললেই হল !

ঃ রমলার দিদি খুব সরল আর ইমোসন্যাল ছিল।

ঃ সে দোষ কি জগদীশবাবুর ?

ঃ কেন উনি সে বেচারাকে পাগল করে দিয়েছিলেন !

ঃ এরকম তেজী বিদ্রোহী পুরুষের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গিয়েছিল কেন রমলার দিদি ? সামলাতে পারবে না, তবু লোভের বশে পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল কেন ? রমলার দিদি করবে বোকামি, শেষকালে নিজের দোষে পাগল হলে দায় পড়বে ওই মানুষটার ঘাড়ে !

ঃ বাঃ বেশ লজিক দিচ্ছ তো ! লভে পড়ার ভান করে রমলার দিদিকে ঠকালো, সে বেচারা পাগল হয়ে গেল, ও বজ্জাতটার দোষ নয় তো কার দোষ ?

ঃ বাজে বকিস নে মিছে। বাপের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, আবার এদিকে ভীষণ একেলে। যেমন টাকা, তেমনি স্মার্ট—আবার যেমন চেহারা তেমনি তেজ। রমলার দিদি জীবন পণ করে নি মানুষটাকে বাগাবার জন্য ? জীবনটা নয় নষ্টই হয়ে যাবে ভেবেই জেনে বুঝে হিসেব করে মানুষটাকে বাগাতে এগোয় নি ? বোকার মত জীবন পণ করে বাজী খেলেছে, হেরে গেছে। তারপর সে মরে গেছে না পাগল হয়েছে সে কথা আলাদা।

এমন নীরস নিষ্ঠুর উগ্র কি করে হল ললিতা?
হুড্রু ফল্‌স দেখতে গিয়ে জগদীশের আশ্রম ঘুরে আসার পর কি যেন হয়েছে ললিতার।
গোড়ায় নয়।
জগদীশকে কিছুতেই বাড়ীতে আনা যাচ্ছে না টের পাবার পর। নিজে বলেছিল আসবে। ছ' মাস চেষ্টা করেও তাকে আনা গেল না।
ললিতার সমস্ত হিসাবনিকাশ বিচার বিবেচনা ভণ্ডুল হয়ে গেল! নিজেকে মনে হল বোকা আর বাঁকা। সস্তা আর বুদ্ধিহীনা। লাখটাকা উড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে, হতে চাইলে নিজেও দু'এক বছরেই লাখপতি হতে পারে জেনে, জগদীশ যেন ওই জঙ্গলের ধারে কুঁড়ে ঘরে দিনরাত্রি কাটাচ্ছে প্রতাপকে বাগাবার জন্য! যার বাপ রেখে গিয়েছে লাখটাকা, যে একটু আল্‌গাভাবে চেষ্টা করলেই বাগাতে পারে লাখটাকা—সে চাইবে সাধু সেজে অরণ্যের প্রান্তে তপস্যা করার ধোঁকা দিয়ে তার শ্বশুরের ঘাড় ভেঙ্গে কিছু টাকা বাগাতে!
নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে ললিতা।
ছি ছি করেছে।
জগদীশের অতীত জীবন টেনে এনে কেউ তাকে ভণ্ড প্রতিপন্ন করতে চাইলে তাই ললিতার এত রাগ হয়।
প্রথমদিন আশ্রমে তাকে মা বলে ডেকে আর তার দিকে বিশেষ ভাবে তাকানোর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে একবার জগদীশ তাকে

লজ্জা দিয়েছিল। তাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে অস্বীকার করে আবার জগদীশ তাকে জব্দ করেছে—নিজের কাছে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে তার অন্তরের হীনতা আর দীনতা।

প্রতাপের সঙ্গে ইতিমধ্যে সেও কয়েকবার জগদীশকে দর্শন করতে গিয়েছিল। জগদীশের শ্রীমুখ থেকে নানা লোকের নানা প্রশ্নের জবাবে উপদেশ ও বাখ্যা শুনে এসেছে।

শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে রোমাঞ্চ হয়েছে ললিতার।

খাঁটি সাধক ছাড়া কি কেউ সব বিষয়ে সব কথা এমন স্বচ্ছ ও গভীরভাবে জানতে ও বুঝতে পারে, এমন সহজ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে পারে?

ললিতা ঠিক করেছে—আর বোকামি করা নয়, পাকামি করা নয়। আর বিচার নয়, সন্দেহ করা নয়। এবার থেকে অন্ধ ভক্তি।

কে জানে, নিজের যে বিশ্রী মেয়েলি খুঁতটা আজও সে গোপন রাখতে পেরেছে, আলোককে টের পেতে দেয় নি যে মিলন তার কাছে প্রাণান্তকর অভিশাপের সমান, বিয়ের আগে যে খুঁতের কথা জানা থাকলে জীবনটা সে কুমারী থেকেই কাটিয়ে দিত—হয় তো জগদীশের দয়ায় সেরেও যেতে পারে সেই খুঁতটা!

তাই সুদর্শনা যে-দিন থমথমে মুখ নিয়ে এসে প্রায় খোঁচা দিয়ে বলে যে, কপাল খুলেছে তোমাদের। রবিবার সকালে উনি পদার্পণ করবেন তোমাদের বাড়ীতে—

ললিতা ভাবতেও পারে না সে জগদীশের কথা বলছে।

সরকারী একজন বৃহৎ ব্যক্তির পদার্পণ করার কথা ছিল তাদের বাড়ীতে—মোটে দু'দিনের জন্য ফ্লাইং ভিজিট।

ঘণ্টাখানেকের একটা কাজ আছে। গুরুতর ব্যাপার, পাহাড়ী উপজাতীয় মানুষদের সঙ্গে লড়াই করার মত ব্যাপার। এমনই একটা বিশ্রী বীভৎস অন্যায় করা হয়েছে বুনো অসভ্য মানুষদের উপর যে তারা ক্ষেপে যেতে বাধ্য হয়েছে।

বন্দুক-কামানধারী সরকারের বিরুদ্ধে তারা তীর ধনুক খাণ্ডা ঝাণ্ডা বর্শা বল্লম নিয়ে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে।

তুচ্ছ ব্যাপার! তবু সাংঘাতিক ব্যাপার! দু'এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপার বুঝে মিষ্টার দাস সবদিক সামলে রাখার সহজ সরল উপায়টা বাতলিয়ে দিতে পারবেন বটে। তার পরামর্শে বুনো মানুষগুলোকে শান্ত এবং নত করা যাবে বটে—কিন্তু?

সুদর্শনা মিষ্টার দাসের কথা বলছে ভেবে ললিতা বিরক্তির সঙ্গে বলে, মিস্টার দাস তো রবিবার বিকেলে আসবেন। তিনি আসছেন জরুরী কাজে। তোমার কাছে তার আসাটা এমন জরুরী ব্যাপার কেন হল ভাই?

ঃ মিস্টার দাসের কথাতো আমি বলছি না।

ঃ কার কথা বলছ?

ঃ তোমাদের নতুন গুরুদেবের কথা বলছিলাম। আসবেন বলেও যিনি না এসে এসে, তোমাদের তুচ্ছ করে করে—

ঃ ও! তাই বল। এমন করে তুই কথা বলিস, কি বলছিস

বুঝতেই পারি না। মেয়েছেলের পেটে বেশী বিদ্যে হলে বুঝি এমনি কথার ছিরি হয় ?

মোটাসোটা সুদর্শনা রাগ করলেই তার টেবো টেবো ফর্সা গালে যেন সিঁদুরে মেঘের রঙের ছোঁয়াচ লাগে, নীল শিরার লাল রঙের আর্টিষ্টিক প্রকাশ ঘটে।

বেত বা চাবুক মারলে নীল শিরায় লাল রক্ত শুধু আঁকতে পারে কালচে দাগ,—সেরকম নয়।

গায়ে পড়ে খোঁচা দিয়ে অপমান করতেই সে এসেছিল, আক্রমনের কায়দা চোখের পলকেই যেন পাল্টে দেয় সুদর্শনা।

হঠাৎ সে হাতের তালুতে মাথা নামিয়ে মিনিট খানেক শব্দ করে নিশ্বাস নেয়। মাথা তুলে বলে, কি বিশ্রী বদ্ধ ঘর তোমার ললিতাদি ! এ ঘরে ছেড়ে দিলে কেষ্ট-রাধা প্রেম ভুলে যেত— ঘটে জিয়ানো মাছের মত হাঁপ কাটত !

ললিতা টের পায় সুদর্শনার সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলেই ঝগড়া বাড়বে। সুদর্শনাকে কি বলা সম্ভব যে কিছুদিন আগেও বিলাত-ফেরত মহা-জ্ঞানী মহা-পুরুষ ওই মানুষটার জন্য তার কিছুমাত্র মাথা ব্যথা ছিল না ?

সুদর্শনার বিয়ে হয় নি।

ওকে কি বোঝানো যাবে যে এদেশে কুমারী মেয়ে যা ভাবে, বৌ আর মা হতে সুরু করে তাকে ভুলে যেতে হয় আগেকার হিসাবনিকাশ ?

ক্রমে ক্রমে কতবড় অসম্ভবকে সম্ভব করার আশা জগদীশ তার

মধ্যে জাগিয়েছে, কেন আর কি ভাবে জাগিয়েছে, সে সব কথা কি বুঝবে কৃতী ছাত্রী কুমারী সুদর্শনা ?

ছ' মাস সাধ্য সাধনার পর মহা সাধককে গৃহে পদার্পণ করাতে রাজী করানো গেছে।
জটা নেই। ফোঁটা চন্দন কাটে না। গেরুয়া বসন পরে না। ধুতি লুঙ্গি পায়জামা সবই সমান রকম সই। গেঞ্জি বা সার্ট গায়ে চাপায়। গরম লাগলেই খালি গা!
বিরাট বিস্তৃত পাহাড়ী বন। তার ধারে আল্পনার ছবির মত গাঁ। তারই একটা সভ্যতা-বিবর্জিত কুঁড়ে ঘরে হাজার খানেক বাংলা ইংরাজী সংস্কৃত বই আর এক কোণে আধ হাত উঁচু থালা বাসন রাখার মাটির বেদীতে মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ির সঙ্গে কয়েকটা কাঁচের গ্লাস এবং কয়েকটা দেশী বিলাতী মদের বোতল।
কোথাও কোন গোপনতা নেই!
সহুরে একজন শিক্ষিত শুদ্ধ স্বাত্বিক পুরুষ করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, মদ খান কেন ?
ঃ তুমি খাওয়াও তাই খাই। এই জঙ্গলে এসে ধাওয়া করেছ তোমার জীবন-সমস্যার অঙ্ক আমায় কষে দিতে হবে। তুমি অভাব অশান্তির মাতাল, বিলাতী মদ না খেয়ে তোমার মত নেশাখোরকে লাগসই কথা বলে ভোলাতে পারি না, তাই মদ খাই।

কৃতার্থ হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গদগদ ভাষায় সে বলেছিল, মদ খাওয়া আপনাকে মানায়। বিষ পান নীলকণ্ঠেরই কাজ। মদ খাওয়া নিয়ে কত লুকোচুরি লোকের, মস্ত অপরাধ করছি। আপনি বোতল সাজিয়ে রেখেছেন, জিজ্ঞাসার অবকাশ না রেখে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন, ওসব আপনার চলে। মহাদেব যেমন কণ্ঠ বিষে নীল করে রেখেছেন সবাইকে জানাতে যে তিনি বিষ খান—বিষ আর অমৃত শুধু তাঁর কাছেই সমান।

মানুষটাকে মনে হয়েছিল পাগল। পরে জানা গিয়েছিল সে একজন নাম করা কবি ও সাহিত্যিক।

চতুর্থ অধ্যায়

জগদীশ সহরে আসবে, প্রতাপের বাড়ীতে পদার্পণ করবে। শুধু প্রতাপের বাড়ীতে নয়, আরও অনেকের বাড়ীতে উৎসাহ উত্তেজনা দেখা যায়।

পাহাড়ের উঁচু সহর।

দার্জিলিং-এর সঙ্গে তুলনা হয় না। কিন্তু শীতের আমেজ সুরু হতে না হতেই যেন সকালে সন্ধ্যায় শীত জোরালো হয়ে ওঠে। অকাল বর্ষা নামলে তো কথাই নেই। হাড়-কাঁপানি ঠাণ্ডা পড়ে। সকালে জগদীশ আসবে। রাত্রে সুরু হল বৃষ্টি। যার জের চলল সকালেও।

সকলে হতাশ হয়ে ভাবল, এই আবহাওয়ায় জগদীশ কি আর আসবে?

গাড়ী পাঠাতে জগদীশ নিষেধ করেছিল। তবু প্রতাপ ভোর রাত্রে গাড়ী পাঠিয়ে দেয়।

মনিব নিজে ডাকতে এলেও মাইনে করা ড্রাইভার নন্দ বালিশ থেকে মাথা পর্য্যন্ত তোলে না, বলে, আজ্ঞে আমার জ্বর হয়েছে, গায়ে হাতে ভীষণ ব্যথা।

ভাগ্নী-জামাই আশ্রিত তরুণকে দিয়েই অগত্যা গাড়ী পাঠাতে হয়। তরুণকে গাড়ী চালাতে দিতে ভয় করে। স্পিডের দিকে ওর এমন বিশ্রী রকম ঝোঁক যে কবে কখন সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে বসে ভাবলেই হৃৎকম্প হয়।

ভোর রাত্রে পাহাড়ী উঁচুনীচু রাস্তায় সে কী স্পিডে গাড়ী চালিয়ে জগদীশের আশ্রম ঘুরে ফিরে আসে, অনায়াসে টের পাওয়া যায় শুধু তার যাতায়াতের সময়ের হিসাব কষে।

যাই হোক, অক্ষত গাড়ীটা নিয়ে জীবন্ত মানুষটা যে ফিরেছে তাই ঢের।

কিন্তু ব্যাপার কি? খবর কি?

আশ্রমে পৌঁছে তরুণ শুনতে পায় এই জল-বাদলার শীতের মধ্যে রাত তিনটেয় জগদীশ গরুর গাড়ীতে সহরে রওনা হয়েছে!

ফিরবার পথে তরুণ নাগাল ধরেছিল গরুর গাড়ীটার।

গাড়ী থামিয়ে জগদীশকে বলেছিল, এখনো তো আদ্দেক রাস্তা বাকী। আমার গাড়ীতে নেমে আসুন, চটপট পৌঁছে যাবেন।

ছই-এর নীচে খড়ের বিছানায় আধ-শোয়া জগদীশ মাথা তুলেও তাকায়নি।

ঃ বেশ যাচ্ছি ঢকাস্ ঢকাস্ করে। ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব।

সকলকে গরম জামা চাদর বার করতে হয়েছে, গায়ে চাপাতে হয়েছে অকাল বর্ষার অস্বাভাবিক শীতে।

জগদীশ গরুর গাড়ী থেকে নামে খালি গায়ে আলগা একটা পাতলা সুতির চাদর জড়িয়ে।

গাড়ী চালিয়ে এনেছে জিরাই। তার গায়ে মোটা নীরেট চটের মত বুনো সুতীর চাদর।

সবাই ব্যাকুল হয়ে ভাবে যে এই কনকনে ঠাণ্ডায় জগদীশ উড়ানী গায়ে দিয়েছে, এটা কি বাহাদুরী দেখানো ?

সুদর্শনা সবার আগে মুখ খুলে প্রশ্ন করে, এর কোন মানে হয় ? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে না ?

জগদীশ হাসিমুখে তাকে অভয় দিয়ে বলে, যার কোন সুখ নেই, তার কখনো অসুখ হয় ?

সকলে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। হ্যাঁ, একটা গুজব তারা শুনেছে বটে।

রক্ত জমাট করা খাঁটি শীতের রাত্রি। বনের রাত্রিচর হিংস্র পশু পর্য্যন্ত আশ্রয়ে মুখ গুঁজে আছে।

কম্বল গায়ে জড়িয়ে জগদীশ রওনা দিত হুড়ু জলপ্রপাতের দিকে। বরফের মত ঠাণ্ডা পাষাণে কুয়াসা-ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদের ক্ষীণ আলোয় ভীতিকর রহস্যময় প্রপাতের দিকে চেয়ে বসে থাকত।

একদৃষ্টে। ধ্যানীর মত, যোগীর মত, ঋষির মত।

অন্য সকলে মেতে যায় জগদীশকে নিয়ে, সুদর্শনা জিরাইকে ডেকে নিয়ে যায় নিজেদের বাড়ীতে।

বুড়ো বুনো মানুষটাকে আদর করে বসায়, ষ্টোভ ধরিয়ে চা করে দেয়, খাবার খাওয়ায়।

বাড়ীর সকলে প্রতাপদের বাড়ী গেছে জগদীশের বিলম্বিত পদার্পণকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে।

নিশ্চিন্ত মনে স্থদর্শনা প্রশ্ন করে, রাত হুপুরে সত্যি উনি জল-ঢোঁরপায় যান? সারারাত বসে থাকেন?

জল-ঢোঁরপা! জিরাই-এর হাসি পায়, রাগও হয়। তবু সে হাসে না, ক্ষমা করে। কে জানে কোথায় কার কাছে শুনেছে জলপ্রপাতের বুনো ভাষার নাম, কি শুনে কি বুঝে কিসে জড়িয়ে গিয়ে স্থদর্শনার কাছে সে নামটা হয়েছে জল-ঢোঁরপা!

বুড়ো জিরাই হাসিমুখে চা খায়, কথা কয় না। স্থদর্শনা অনর্গল প্রশ্ন করে যায়, জিরাই শুধু মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে জানায় যে সব প্রশ্নই সে শুনছে।

তারপর পৃথিবীর সেরা জ্ঞানীর মত বলে, বাবার কথায় জল-ঢোঁরপা চলে। বাবা বললে নামে, বললে থামে।

স্থদর্শনা টের পায়, মনে মনে জিরাই হাসছে, মানুষের ভৌতিক শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাসী বুনো বুড়ো খোকা সেজে তার সঙ্গে রসিকতা করছে।

এমন আশ্চর্য্য হয়ে যায় স্থদর্শনা যে রাগ করার কথা তার মনেও পড়ে না। জগদীশকে দেবতার মত ভক্তি করে কিন্তু জিরাই জানে মানুষের মুখের হুকুমে জলপ্রপাত থামে না, চলেও না।

জগদীশের শিক্ষার ফল?

অথবা—?

তার মুখ দেখে জিরাই এবার নিজে থেকেই তার কৌতুহল মেটায়, জগদীশের কথা বলে। গোড়ার দিকে জগদীশ মাঝে মাঝে মাঝরাত্রে প্রপাতে যেত, পাথরে বসে সাধনা করত। শীত বর্ষা গ্রাহ্য করত না।

ফাঁকি নয়, বানানো গুজব নয়। শুধু জিরাই নয়, আরও পঞ্চাশ ষাটজন সাক্ষী আছে—নিজের চোখে যারা জগদীশকে মাঝরাত্রে একা প্রপাতের দিকে যেতে দেখেছে, সাত রাত সেখানে বসে যোগসাধনা করতে দেখেছে।

ষ্টোভটা পাশেই জ্বলছিল। চা খাবার করতে করতেই জিরাইকে পাশে বসিয়ে সুদর্শনা সুরু করেছিল তার জেরা করার আলাপ।

কোথা থেকে ভৌতিক বাতাস আসে, পিছনে ঝুলানো শাড়ীর আঁচলটা দোলা খেয়ে গিয়ে ষ্টোভের আগুনে জ্বলে ওঠে।

উবু হয়ে বসেছিল জিরাই, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে এগিয়ে কড়া হাতের তালুর চাপড়েই ধরা আঁচলটা নিভিয়ে দেয়।

সুদর্শনা যেন স্বপ্ন থেকে জাগে।

: হাতে ছ্যাঁকা লাগেনি তো তোমার? মলম লাগিয়ে দেব?

জিরাই শুধু মাথা নাড়ে।

সুদর্শনা ভেবেছিল, পনের বিশ মিনিটের বেশী লাগবে না জিরাইকে কাছেই নিজেদের খালি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সত্য মিথ্যা নির্ণয় করতে।

এরা এখনও মিথ্যা বলতে শেখেনি, আদিম সত্যের কবলেই এখনো এরা পড়ে আছে। সরলভাবে দরদ দেখিয়ে ডেকে আদর করে ভালমন্দ খেতে দিলে বুনো মানুষটার মুখ খুলে যাবে। জানা যাবে মাঘের রাতেও জগদীশের প্রপাতে গিয়ে সারারাত সাধনা করার গুজবটার সত্য মিথ্যা।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে সুদর্শনা টের পায়, দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে জিরাইকে জেরা করতে!

মাথাটা ঘুরছিল। অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কিছুই সে বুঝতে পারল না বুনো অসভ্য মানুষটাকে দেড় ঘণ্টা জেরা করে।

জিরাইকে সে বিদায় দেয়।

: ছেলে এবার তুমি ফিরে যাও। পথ চিনে যেতে পারবে?

: ছেলে? ছেলে বানালি?—আনন্দের হাসিতে যেন ফেটে পড়ে জিরাই!

জিরাই চলে গেলে খালি বাড়ীতে নিজের ঘরে একলা বসে সুদর্শনা ভাবে, কী বুঝতে চেয়ে সে কী বুঝল? দেহমনটাই বিগড়ে গেল নিজের।

ঝোঁকের মাথায় নয়। আত্মহত্যার নেশায় নয়। জগদীশ তবে সত্যই হুড্রুতে মাঝ রাত্রে যেত যোগ সাধনা করতে?

সেই মারাত্মক সাধনা তাকে এমন মহাপুরুষত্ব দিয়েছে যে প্রতাপবাবুরা তাকে একটিবার বাড়ীতে আনার জন্য ছ' মাস ধরে সপরিবারে সাধনা করে?

তার বাড়ীর ছেলেবুড়ো মেয়ে-পুরুষ সকলে যোগ দেয় সেই সাধনায় ?

সারাদিন কাটে রাঁচি সহরে।

কলকাতা লণ্ডন থেকে পৃথিবীর এ সহর ও সহর চষে এসে রাঁচি সহরের গা-ঘেঁষা খাঁটি আদিম অরণ্যের মধ্যে অসভ্য আদিবাসীদের সঙ্গে বাকী জীবনটা সংক্ষেপে শেষ করে দিতে দেশী বিলাতী জংলী নেশাটা বেপরোয়া হয়ে চালাতে গিয়েই জগদীশ টের পেয়েছিল এভাবে মরা তার আত্মহত্যা করার চেয়ে সহজ হবে না।

চিত্রার মানের জন্য তার মৃত্যু শুধু কষ্টকর হবে না—অর্থহীন হবে।

বহুদিন পরে সহরের সভ্য মানুষদের মধ্যে দিনটা কাটাতে কাটাতে বার বার জগদীশের মনে প্রশ্ন জাগে ঃ এইখানেই কি জের মিটবে ? অথবা এমনিভাবে হাত বাড়িয়ে জীবন তাকে আবার টেনে আনবে সহরে ?

পঞ্চম অধ্যায়

দিন দিন আরও বিচিত্র হয়ে ওঠে দর্শনার্থীদের সমাবেশ। ছাত্ররা পর্য্যন্ত আসতে সুরু করে।

সকলকে সামলায়। সকলের প্রাণকে নাড়া দেওয়ার মত কথা বলে। দেশ-বিদেশের মানুষ আর দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কথাই যেন তার অজানা নেই।

নগেন ও প্রতাপেরা মিলেমিশে সপরিবারে যেদিন গিয়েছিল তার আশ্রমে সেদিন সে ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল কুড়ি-বাইশজন কলেজের ছাত্রকে।

তারাও পৌঁচেছিল কিছুক্ষণ আগেই। সবে মাত্র প্রশ্ন করা সুরু হয়েছিল।

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে জগদীশ হঠাৎ কড়া সুরে বলে, তোমরা কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসেছ, না, সত্যি তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

একটি ছেলে বলে, আমরা সিরিয়াসলি জানতে বুঝতে এসেছি সার!

মুখ দেখেই টের পাওয়া যায় ছেলেটি খুব চালাকচতুর এবং ভাবুক প্রকৃতির।

ঃ এই বুঝি তোমাদের সারের কাছে সিরিয়াসলি জানতে বুঝতে আসার নমুনা! কি জানতে বুঝতে চাও তাই তোমাদের ঠিক নেই। যার যেমন খুশি এলোমেলো প্রশ্ন করে যাবে আর আমি আবোলতাবোল বকব? নিজেরা পরামর্শ করে ঠিক করে আসতে পারনি কি তোমাদের জিজ্ঞাসা?

আরেকটি ছেলে বলেঃ আমাদের অনেক রকম জিজ্ঞাসা কিনা—

এ ছেলেটিও কম সিরিয়াস নয়। তার ব্যাকুল উৎসুক ভাব থেকেই তা টের পাওয়া যায়।

ঃ মাষ্টারমশাইদের জিজ্ঞাসা কোরো। আমি এলোমেলো প্রশ্নের জবাব দেব না।

চালাক চতুর ভাবুক ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমাদের ভুল হয়ে গেছে সার। একটু সময় দিন, আমরা প্রশ্নগুলি ছকে ফেলছি।

জগদীশের দিকে পিছন ফিরে তারা গোল হয়ে বসে এবং গুঞ্জরিত মুখরিত হয়ে ওঠে। মনে হয় না জগদীশকে কি প্রশ্ন করা হবে এ বিষয়ে কোনদিন তারা একমত হতে পারবে!

কয়েকমিনিট পরেই কিন্তু তাদের মুখরতা থেমে যায়। দেখা যায় চালাক চতুর ভাবুক ছেলেটি আলোচনা চালাবার নেতৃত্ব নিয়েছে। মিনিট পাঁচেক ধরে সে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দেয়—তারপর অভিজ্ঞ ও দক্ষ নেতার মত বৈঠকের আলোচনা পরিচালিত করে কাগজে কলমে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রশ্ন ছকে জগদীশের দিকে ঘুরে বসে।

বলে, আমাদের প্রধান জিজ্ঞাসা তিনটি। ধর্ম কি? ভগবান কি? বিজ্ঞান সত্য না ধর্ম সত্য? আপনার জবাব শোনার পর হয় তো আমরা আরও দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।

জগদীশ একটু হেসে বলে, এটা কি তোমাদের ডিবেটিং ক্লাবের মিটিং? আমি যেটুকু জানি যেটুকু বুঝি বলব—তর্ক করতে পারব না।

: আমরা কি তর্ক করতে এসেছি সার? আপনার কথা শুনতে এসেছি। আপনার কথা কিভাবে নেব, কতটা মানব কতটা মানব না সেটা আমরা ঠিক করব, আপনাকে ভাবতে হবে না।

: তোমার কি নাম?

: বরেন দত্ত। আমি গুণময় দত্তের ছেলে।

: ফিলজফার গুণময় বাবুর ছেলে? বেশ, বেশ। কি পড়ছ?

: বি এস সি। ফোর্থ ইয়ার।

প্রতাপ ও নগেনের পরিবার এবং সমবেত অন্যান্য ভক্তেরা নীরবে কলেজী ছাত্রদলটির সঙ্গে জগদীশের আলাপ-আলোচনা শোনে।

তাদের যেন কোন প্রশ্ন নেই, তারা যেন কোন আশা নিয়ে আসেনি।

জগদীশ হাসিমুখেই বলে, তোমাদের তিনটে প্রশ্নই অর্থহীন। কেন অর্থহীন জানো? এসব প্রশ্নের জবাব তোমাদের কোন কাজে লাগবে না। এটাই কি ছাত্রদের আসল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—ধর্ম, ভগবান আর বিজ্ঞানের মিল কতটা?

জগদীশ মাথা নাড়ে।—ঐ প্রশ্নগুলি তো তোমাদের প্রাণের প্রশ্ন নয়, আসল প্রশ্ন নয়!

ছাত্রেরা চুপ করে থাকে। অন্য সকলেও চুপ করে থাকে। জগদীশকে তারাও খানিকটা জেনে বুঝে গিয়েছে বৈকি। তার প্রশ্নের জবাব দেবার ষ্টাইল খানিকটা ধরতে পেরেছে বৈকি।

তিনটি প্রশ্নের নিগূঢ় প্রশ্নের জবাবে জগদীশ কি বলে শুনবার জন্য সকলেই কাণ খাড়া করে ছিল। সকলেই কমবেশী হতাশা বোধ করে। জগদীশ কি এড়িয়ে গেল প্রশ্নগুলি?

এমন তো সে কোনদিন করে না!

জগদীশের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটতে দেখে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

: কাজেই আমাকে এসব প্রশ্ন করা তোমাদের চ্যাংড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। কোনদিন ভাবো না ধর্ম কি—ভাববার দরকার হয় না। ও তো জানাই আছে, ধর্ম মানে কুসংস্কার। ভগবান কি তাও জানাই আছে—তিনি হলেন আঁধার ঘরের বোকা মানুষদের ভোলাবার জন্য আলোর ঘরের মানুষদের কল্পনা—বিরাট একটা ধাপ্পা। বিজ্ঞান তো ডাল-ভাত। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পড়তে শুনতে দেখতে আকাশে উড়তে, হাতের কাছের সূক্ষ্ম অদৃশ্য জিনিষ আর কোটি মাইল দূরের সূর্য্যের চেয়ে হাজারগুণ বড় অদৃশ্য পদার্থ দেখতে—

জগদীশ আবার সকৌতুকে হাসে।

সকলে কৃতার্থ হয়ে নড়ে চড়ে বসে। না, এড়িয়ে যাবে কেন। প্রশ্নগুলি কি ধাঁচের বিবেচনা করতে হবে তো! জগদীশ ভূমিকা করছে।

ঃ ধর্ম দিয়ে যা হয়নি, ভগবান দিয়ে যা হয়নি—বিজ্ঞান তাই করেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করেছে, কিসে কি হয় কেন হয় মানে বুঝিয়ে দিয়েছে—আবার কাজে করে দেখিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান শুধু কথা নয়, হাতে-নাতে বিজ্ঞান নিজেকে প্রমাণ করে করে এগোয়। বিজ্ঞান শুধু জ্ঞান নয়—বিজ্ঞান।

বরেন মুখ খুলতে যেতেই সে হাত বাড়িয়ে তাকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত জানিয়ে বলে, বিজ্ঞানের মূল কথাটা মুখস্ত করে জেনেছ, ভেবেছ বৈজ্ঞানিক ব'নে গিয়েছি। ধর্ম কি ভগবান কি না ভাবলেও চলবে। বিজ্ঞানে বাতিল হয়ে গেছে ধর্ম আর ভগবান।

বরেন আবার মুখ খুলবার উপক্রম করতেই সুদর্শনা রেগে গিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বলে, চুপ করে থাকুন না পাঁচ মিনিট? উনি কি বলছেন আগে শুনুন না? তার পরেই নয় চ্যাংড়ামি করবেন!

জগদীশ খুশি হয়ে বলে, রেগে উঠে না বুঝে ঝোঁকের মাথায় ধমক দিয়ে বলেছ, কিন্তু বলেছ ঠিক কথাই। বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের ছাত্রের এরকম অধৈর্য্য অস্থিরতা হাতে-নাতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মত দেখিয়ে দেয় জগতে আজ ধর্মান্ধতার পাশাপাশি বিজ্ঞানান্ধতাও আছে। তাই তো কষ্ট হল মনে, তাই তো

বিদ্বান বুদ্ধিমান নওজোয়ানদের বলতে হল তোমরা আমায় চ্যাংড়ার মত প্রশ্ন করেছ।

এবার জগদীশ প্রশান্তভাবে হাসে।

ঃ বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে জানে না বিজ্ঞানের আসল ভূমিকা কি—এটা কত বড় আপশোষের কথা তোমরাই বলত? ধর্মবিশ্বাসকে উৎখাৎ করা ভগবানকে বাতিল করা—এই কি বিজ্ঞানের কাজ, বিজ্ঞানের আসল কথা? বিজ্ঞান কি হিন্দু মুসলিম ক্রিশ্চান ইত্যাদি ধর্মের বিরুদ্ধে গজানো নতুন আরেকটা ওই জাতের ধর্ম? বিজ্ঞান জানে মানুষের প্রয়োজনেই ধর্ম, মানুষের প্রয়োজনেই ভগবান—প্রয়োজনটা বাতিল না করে ধর্মবিশ্বাস বা ভগবানকে ছুটো যুক্তি দিয়ে আক্রমণ করে বাতিল করার ছেলেমানুষী কি বিজ্ঞানের পোষায় না মানায়? ওসব মানুষের প্রয়োজন কেন তাই নিয়ে বিজ্ঞান মাথা ঘামায়,—কোন অবস্থায় কেন মানুষের ভগবান দরকার হয়, কোন অবস্থায় কিভাবে মানুষ নিজেই ভগবান হতে পারে জানবার বুঝবার চেষ্টা করে। ধর্মের সঙ্গে সোজাসুজি কোন বিরোধ নেই বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান কখনো কোন ধর্মকে গাল দেয় নি, কখনো দেবেও না। ভগবান আছেন কি নেই, বিজ্ঞান তা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায় নি, কোনদিন ঘামাবেও না।

অনেকবার দমিয়ে দেওয়া হয়েছিল বরেনকে, মুখ খুলতে গিয়েও কথা বলতে পারে নি। এবার সে যেন ফেটে পড়ে। চীৎকার করে বলে, বিজ্ঞান ধর্মকে মানে?

তার এই উদ্ধত্যে সমাবেশ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠা মাত্র হাসিমুখে তু'হাত প্রসারিত করে সকলকে জগদীশ চুপ করিয়ে দেয়।

ঃ তোমরা সবাই অস্থির হয়ো না। তোমরা আমায় শিক্ষা দিলে বটে—নতুন শিক্ষা দিলে। বাবার শ্রাদ্ধ করার সময় ঘরের লোকদের সঙ্গে আমার একটা খণ্ড-যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বংশের নিয়ম বাপের শ্রাদ্ধে অন্নসত্র খুলতে হবে—যে আসবে তাকেই তিনদিন ভরপেট অন্ন দিতে হবে। সকলে বারণ করেছিল। ভীষণ তুর্ভিক্ষের কাল, কয়েক শ' ভিখারিই তো শুধু আসবে না। দারুণ আকালে তারাও আসবে যারা মরে গেলেও ভিক্ষে করতে বার হবে না কিন্তু বাপের শ্রাদ্ধে কেউ সার্বজনীন নেমন্তন্ন জানিয়েছে শুনলেই সপরিবারে এসে হাজির হবে। আমি কারো কথা শুনিনি, জিদ করে অন্নসত্র খুলেছিলাম। তিনদিনের ধাক্কা সামলাতে সব চেয়ে বড় খাস তালুকটা বেচে দিতে হয়েছিল। উপোস করে যারা মরছে তাদের খাওয়ানোর জন্য নয়—নিজের জিদ বজায় রাখার জন্য। যা খুশি করার জিদ বজায় রাখার জন্য তার আগে তিনটে তালুক বাঁধা দিয়েছিলাম, লাখ টাকার মত ঋণ করেছিলাম। তাতে আমার আপশোষ হয়নি। বাপের শ্রাদ্ধের নিয়ম মানার জিদ রাখতে, তিনদিন যে আসবে তাকেই খাওয়ানোর জিদ রাখতে তালুকটা দিতে হয়েছিল বলে মাথার চুল ছিঁড়েছিলাম।

গুম খেয়ে গেছে আসর। জগদীশ টের পায় সবার মনের

মোট কথাটা। প্রসঙ্গ পালটে গেল? ছেলেরা পুরো জবাব পেল না? নিজের কথা বলতে শুরু করল জগদীশ।
আবার জগদীশ হাসে।
ঃ ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি ভাবলে তো সবাই?
তার হাসি আর প্রশ্নের কায়দায় একমুহূর্তে মনের মোড় ঘুরে যায় সকলের। আবোলতাবোল কথা কি বলতে পারে জগদীশ—নিজের কথা বলা কি তার পেশা!
কী কথায় কী কথা কেন টেনে এনেছে নিজেই সে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবে নিশ্চয়।
ঃ এই জিদের চেহারা হল তু'রকম। একটা চেহারা—ফাঁকা অহঙ্কার। লোকে কি বলবে, লোকে কি ভাববে মনে করে কেঁউ কেঁউ করছে মনটা—সেটাই প্রকাশ পাচ্ছে লোকের কাছে বাহাতুরীর করার চেষ্টায়। তালুক বেচে মাথার চুল ছিঁড়ব, চির-তুর্ভিক্ষের দেশে তবু চালিয়ে যাব তিনদিনের অন্নসত্র। জিদটার আরেক চেহারা হল জ্ঞানের অহঙ্কার। আমি যেটুকু জেনেছি সেটুকুই চরম জ্ঞান। আমরা সবাই জানি অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, কিন্তু কেন ভয়ঙ্করী তা জানি না। মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান বাড়িয়ে চলার সাধনায় চিরদিন সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে থেকেছে আমিত্বের অহঙ্কার। আমি যেটুকু জানি সেটা জানাই যথেষ্ট—এই অহঙ্কার।
সকলের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থেকে জগদীশ আমোদের হাসিতে শব্দিত হয়ে ওঠে।
ঃ ভাবছ তো আমি মানুষের নিন্দা করছি? দোষ দেখাচ্ছি?

না-বিদ্যা অল্পবিদ্যাওলাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় শত্রু বলছি? বরেনকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ওদের অল্পবিদ্যার চ্যাংড়ামিই জ্ঞান বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় বিপদ? তোমরা ভুল কথা ভাবছ—আমি যা বলতে চাই তার উল্টো কথা ভাবছ!

কেউ কথা বলে না।

ঃ মানুষের ধর্ম ভগবান জ্ঞান বিজ্ঞানে সভ্যতা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, এখনো দাঁড়িয়ে আছে? সত্যের ভিত্তি ছাড়া দাঁড়াবার কোন অবলম্বন ছিল না মানুষের, আজও নেই। সত্যকে ধরেই মানুষ এতদূর এগিয়েছে, আরও এগোবে। তোমার আমার মুস্কিলটা কি জানো? সত্য কি তার নানারকম ব্যাখ্যা শুনি, নিজেরাও নানারকম মনগড়া ভাবার্থ করে নিই। তবে এ বিভ্রান্তি কেটে যাচ্ছে। সত্য কি তাই নিয়ে যে নানারকম ধারণা, এ যুগে আমরা এটাকেও সত্য বলে জানতে পেরেছি, মানতেও পেরেছি। সকলে নয়—কিছু লোকে পেরেছি। সত্য সম্পর্কে ধর্ম আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎটা এবার ধরবার চেষ্টা কর। বিজ্ঞান বলে আমরা যতটা জেনেছি ততটাই সত্য,—অনেক সত্য আমরা জানি না। নতুন সত্য জানার পর হয় তো এখন যেটা সত্য বলে জানি সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে কিন্তু যতদিন বিজ্ঞানের বিচারে এটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে থাকবে ততদিন এটাই আমাদের কাছে সত্য।

বরেন প্রশ্ন করে, কিন্তু কতগুলি মূলনীতিকে বিজ্ঞান কি

চিরদিনের জন্য অভ্রান্ত বলে না? নতুন আবিষ্কারের ফলে আজকের একটা থিয়োরীর বদলে নতুন থিয়োরী হতে পারে—এটা বিজ্ঞান মানে। কিন্তু বিজ্ঞান কি বলে না, চিরকাল দু'ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন মিলে জল হবে, অন্য কিছু হবে না?

ঃ না। বিজ্ঞান অমন একগুঁয়ে নয়।

বরেন আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

জগদীশ বলে, 'চিরদিন' 'সীমাহীন' 'অনন্ত' এসব কথার মানেটাই বিজ্ঞানে গ্রাহ্য—সীমাহীনকে মগজে একটা ধারণার রূপ দেবার চেষ্টা বিজ্ঞান করে না। পদার্থের রূপান্তর বিজ্ঞানের একটা সত্য। কাজেই বিজ্ঞান কি করে চিরদিনের কথা বলবে? একদিন হয় তো হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন বলে কিছু পৃথিবীতেই থাকবে না, অন্য কিছু হয়ে দাঁড়াবে। বিজ্ঞান তাই বলে, এখনকার অবস্থা যতদিন থাকবে দু'ভাগ এই হাইড্রোজেন আর এই অক্সিজেন মিলে জলই হবে, অন্য কিছু হবে না।

সুদর্শনা বলে, এবার ধর্মের সত্য আর বিজ্ঞানের সত্যের তফাতের কথা বলুন।

জগদীশের মুখে হাসি দেখা দেয়।—সত্য আবার ধর্মের বা বিজ্ঞানের হয় নাকি? সত্যকে একভাবে জানা আর মানা হল ধর্ম, অন্যভাবে জানা আর মানা হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কিভাবে সত্য নেয় বলেছি—নতুন সত্য অথবা সত্যের নতুন রূপ

আবিষ্কৃত হতে পারে এটা বিজ্ঞান মানে কিন্তু অনাবিষ্কৃত অপ্রমাণিত সত্য বিজ্ঞানের কাছে সত্য নয়। ধর্ম বলে, আমি সমগ্র সত্য জানি, চিরন্তন সত্য জানি। ভগবান বা ভগবানের মত কোন সত্যকে মূল ধরে নিয়ে ধর্ম বাস্তব জগতের সত্যকে বিচার আর বাখ্যা করে। সমস্ত ধর্মেই যে অন্য সব কিছুর সঙ্গে মানুষের সামাজিক ভাবে বাঁচার নিয়ম-নীতির বিধান রাখতে হয়, এটা কখনো খেয়াল করেছ বরেন?

বরেন মৃদু ও কাতর স্বরে বলে, আপনার বুঝিয়ে দেবার প্রসেসটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি বলে—

ঃ আমি তো রাগ করি নি ভাই।

ভাই!

প্রভাপেরা যাকে বাবা বলে ডাকে, কলেজের একটা চ্যাংড়া ছোঁড়াকে সে বলছে ভাই!

জগদীশ গম্ভীর মুখে শান্ত কণ্ঠে বলে যায়, তোমার কথার জবাব দিতেই এত কথা বলেছি। একটা মানুষের নিজের চেতনাতেই কত বিরোধ, একই ভাবের কত বিপরীত ভূমিকা। তোমার আমার চিন্তায় কত অমিল আছে ভাব তো? বিজ্ঞান ধর্মকে মানে বলছি ভেবেই তুমি গেলে চটে! কেন চটলে শুনবে? 'মানা' কথাটা মানে তুমি বুঝছ একরকম, আমি বুঝি অন্যরকম। আমি কোন অর্থে বলেছি বিজ্ঞান ধর্মবিশ্বাস মানে, ভগবান মানে? যে অর্থে বলা যায় বিজ্ঞান কুসংস্কার মানে, পাপকেও মানে! ধর্মবিশ্বাস আছে, বিপাকে পড়ে মানুষ

ভগবানকে ডাকছে—এই বাস্তব সত্যটাকে বিজ্ঞান উড়িয়ে দেবে কেন ?

বরেনের মুখে হাসি ফোটে।

ঃ এবার বুঝেছি !

কুঁড়েতে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নেশা সুরু করার জন্য আজ যেন তেমন ব্যাকুলতা নেই।

ধীরে সুস্থে সে নেশা সুরু করে। তাপ্পি এটা ওটা জোগান দিয়ে যায়, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে রাত্রের খাবার তৈরী করে।

রাত্রে জগদীশ খাবে কি খাবে না কিছুই ঠিক নেই—অধিকাংশ রাত্রেই সে কিছু খায় না।

তাপ্পির পরিপুষ্ট সুগঠিত দেহটার দিকে চেয়ে আজ একটি প্রশ্ন জাগে জগদীশের মনে ঃ নারীদেহের কামনা যে তার একেবারে শেষ হয়ে গেছে, কোন নারীদেহ স্পর্শ করার কথা কল্পনা করলেও গভীর বিতৃষ্ণায় সর্ব্বাঙ্গ যে তার কুঁকড়ে যেতে চায়, চিত্রার জন্য মনোবেদনাই কি তার একমাত্র কারণ ? এই যে কড়া বিষ সে পান করে চলেছে দিনের পর দিন, খাদ্যের জন্য খিদে পর্যন্ত যা নিস্তেজ করে দেয়—তার কি কোন প্রভাব নেই তার কামনা ঝিমিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ?

টের পাওয়া যায় তাপ্পি আজ একটু অস্বস্তি বোধ করছে।

ঠিক বটে, রাত হয়ে গেছে।

সকাল থেকে তাপ্পি তার সেবা করে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত—ততক্ষণে নেশা চড়ে যায়। তাপ্পিকে সে হুকুম দেয়, এবার যা, ভাগ।

তাপ্পি চলে যেতে একটু দেরী করলে গর্জন করে ওঠে।
আজ রাত হয়ে গেছে বলেই কি তাপ্পি অস্বস্তি বোধ করছে!
তার ভয়ে?
অথবা তার মরদের ভয়ে?
তাপ্পির মরদ কিরপা অন্যের পরামর্শে সহরের মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করতে চলে গিয়েছিল। তাপ্পিকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল, তাপ্পি যায়নি।
নোংরা বীভৎস কাজ, কঠিন খাটুনি। কিন্তু জীবন সেখানে বড় মজাদার। ধাঙ্গড় মহল্লায় সবাই মিলে নেশা করা, মাঝে মাঝে পোষা শূয়োর পুড়িয়ে হৈ হুল্লোড় করা—এসব মজা কি আর ময়লা ঘাঁটার খাটুনি না খেটে মেলে!
স্বভাব বিগড়ে গেছে কিরপার। উপজাতীয় মরদের জীবন-যাত্রার রীতিনীতি মেনে চলে তার পোষায় না।
তারা মেয়ে পুরুষ খেটে খায়, খুশি হলে মরদ মেয়েমানুষকে মারধোর করবে আর সে নিরুপায়ের মত তা সয়ে যাবে, এ অনিয়মের ধার তারা ধারে না।
সহর থেকে কিরপা নেশার ঝোঁকে তাপ্পিকে গালাগালি করার, চড়চাপড় মারার স্বভাব নিয়ে এসেছে।
জগদীশের কাজ আর সেবা করে তাপ্পি যা পায় তাতেই চলে যায়—কিরপা টের পেয়ে কিছুদিন থেকে সহরে ধাঙ্গড়ের কাজে খাটা বন্ধ করেছে। এখানে এসে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে আছে।

ধাঙ্গড় মহল্লায় উৎসব হবে খবর পেলে তাপ্পির কাছে পয়সা চেয়ে নিয়ে হৈ চৈ করে আসতে যায়।

তাপ্পির মুখে এসব শুনেছিল জগদীশ, জিজ্ঞাসা করেছিল, তাড়িয়ে দিস না কেন?

কতবার তাড়িয়ে দিয়েছে, ক'বার বাপের সঙ্গে ঠিক করে ফেলেছে সামাজিক ভাবে বিয়েটা বাতিল করে নেবে—কিন্তু কিরপাকে নিয়ে হয়েছে ফ্যাসাদ।

নেশা কেটে গেলে সে তাপ্পির পা জড়িয়ে ধরে, ক্ষমা না করা পর্য্যন্ত ছাড়ে না।

ঃ তোকে খুব ভালবাসে, না?

ভালবাসার মানে তাপ্পি জানে না, সে নীরবে জগদীশের মুখের দিকে চেয়ে ছিল।

জগদীশের মনে পড়ে কালও বাড়াবাড়ি করায় কিরপাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ঃ কিরপা চলে গেছে তাপ্পি?

ঃ নঃ! উ যাবেক নাই!

ঃ খাবে কি?

ঃ উ জানে!

ঃ কিরপাকে বলেছিলি তুই আমায় মেয়ে, তুই আমার মা?

তাপ্পি মুখ বাঁকায়।

ঃ তুমার ব্যাটা সহরে ময়লা ঘাঁটে। বদ বনে গেছে।

ঘরের খোলা ঝাপটার আড়ালেই বুঝি ছিল কিরপা।

ভিতরে ঢুকে বলে, খুন করব।

জগদীশ বলে. কর। খুন কর। কাকে খুন করবি? মোকে না মোর ওই মাকে?

খুন করার কোন আদিম অস্ত্রও কিরপা আনে নি, খালি হাতে খালি গায়ে রুখে এসেছে।

ঃ মা? ও তুমার মা?

ঃ সব মেয়ে আমার মা। এই বেটি হল আমার ঘরের মা। আমাকে ভাত খাওয়ায় মদ খাওয়ায়, সামলে চলে।

কিরপার বেশভূষায় অনেকদিন সহরে ধাঙ্গড়গিরি করার ছাপ নেই—পরণে তার বুনো তাঁতে বোনা তুলোর স্তুতোর চটের মত মোটা দেড় হাত কাপড়।

শুধু চেহারায় ছাপ পড়েছে সহরের, শুধু মুখের ভাবে।

একলা ঘরে জগদীশ ভাবে, আজ এত ভাল কেন তার মেজাজ? কই, সারাদিন তো চটেনি দু'একবারের বেশী! কিরপাকে পর্য্যন্ত একটা ধমক দিল না!

ষষ্ঠ অধ্যায়

উদ্‌ভ্রান্ত জীবন কি এনে দিয়েছে উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা আর অনুভূতি ? মাঝে মাঝে জগদীশের এমন উদ্ভট মনে হয় নিজেকে এবং জীবন ও জগতকে !

বড় বড় কথা আজও সে ভাবে, সূক্ষ্ম চিন্তা করতে পারে—সব সময় না হলেও। বড় কথা, সূক্ষ্ম কথা বলে জ্ঞানী অভিজ্ঞ বিষয়ী এবং বয়স্ক ভদ্রলোকদের ভক্তে পরিণত করতে পারে। জগদীশ জানে, ধন মান রূপযৌবন শিক্ষা দীক্ষা অনেক কিছু বাতিল করে বনবাসী হয়েছে বলেই শুধু নয়—এসব ওদের শুধু টেনে আনে তার কাছে।

কিন্তু তেজ আর কথার জোরেই সে ওদের স্থায়ীভাবে বশ করেছে। নইলে বনবাসী সাধু বলে দর্শন করতে এসে প্রণামী দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করেই ওরা যথেষ্ট হয়েছে ভেবে বিদায় নিত—দু'একজন ছাড়া আর আসত না।

কিন্তু মানে কি সব কিছুর ?

তার প্রেমের মানে ? জীবনের মানে ? বুনো মানুষগুলির বাঁচার মানে ? সহরের মানুষগুলির জীবনের মানে ? বনে আত্মহত্যা করতে এসে ধীরে ধীরে তার সাধু হয়ে ওঠার মানে ?

অতল গভীর এক নতুন হতাশা ঘনিয়ে আসে—যা ভাবাবেশের হঠকারিতায় চিত্রাকে জলপ্রপাতে বিসর্জ্জন দেওয়ার চেয়ে যেন ভয়ানক !

আরও কড়া ব্যথায় যেন ঢের বেশী টন টন করে হৃদয় মন !

নেশার ঘুম কিছুতেই আর রাতভোর টানা চলছিল না। ভোর হবার অনেক আগে, ব্রাহ্ম মুহূর্তের অনেক আগে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

একবার মাত্র সে চেষ্টা করেছিল আবার নেশা চড়িয়ে ভাঙ্গা ঘুম জোড়া দিয়ে আবার একটু ঘুমিয়ে ব্যথার রাতটা পোহাতে। পরদিন প্রায় বিকাল পর্যান্ত দেহ মনের অকথ্য বীভৎস যন্ত্রণা তাকে নিজের শরীরের রক্তবাহী শিরা চিরে দেবার অথবা আম গাছের ডালে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়বার জন্য উতলা করে তুলেছিল।

সেই থেকে এমন আতঙ্ক জন্মে গিয়েছে যে রাত তুটোয় নেশার ঘুম ভেঙ্গে গেলেও সে আর ঘুমোবার কৃত্রিম চেষ্টার ধার ঘেঁষে না। ভাবে আর বই পড়ে।

সে রাত্রে কুঁড়েতে বই ছিল মাত্র একখানা—তরুণের লেখা প্রথম কবিতার বই 'ভারতের প্রেতাত্মা।'

নিজেই পয়সা খরচ করে ছাপিয়েছে, বোধ হয় পাশের জোরে বিয়ে করে পাওয়া পয়সায়। সকলে নিন্দা করলেও বইটা খুব বিক্রী হয়েছে—হয় ত সকলের বেশী বেশী নিন্দা করার জন্যই।

ওই বইখানা ছিল।

তরুণ আত্মার প্রচণ্ড আর্তনাদের কান্নায় ভরা বীভৎস মর্মান্তিক বই—সুন্দরের কল্পনায় রঙীন জীবনকে দাঁতে নখে ছিঁড়ে ফেলে দেহীর রক্ত মাংস নাড়িভুঁড়ির স্বরূপ দেখিয়ে জীবনকে অতি-বাস্তব আর সুন্দরকে মৃদুতা মিষ্টতা বর্জিত ভীষণরূপে দেখাবার জন্য লেখা বই।

আর ছিল ঠোঙ্গার কতগুলি টুকরো।

আদিম জঙ্গলের প্রান্তে তার এই বুনো কুঁড়ে ঘরেও সহরে ছাপানো খবরের কাগজের টুকরা দিয়ে তৈরী করা ঠোঙ্গা পৌঁছে গেছে।

জগদীশ পর্যন্ত টের পেয়ে জেনে গিয়ে আমোদ বোধ করেছে যে খবরের কাগজের দৈহিক গতির পরিণতি মুদীখানায় মাল বেচার ঠোঙ্গায়।

মাঝে মাঝে কখনো-সখনো দু'একটা ঠোঙ্গা ছিঁড়ে জগদীশ দু' একটুকরো খবরে চোখ বুলোত।

সেদিন রাত্রে তরুণের বইটা পড়ে খুঁজে খুঁজে ঠোঙ্গা আর ছেঁড়া ছাপানো কাগজের টুকরো সংগ্রহ করে তন্ন তন্ন করে পড়ে রাতটা ভোর করতে চেয়েছিল—

টেরও পায়নি কখন রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল। কখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়েছিল রোদ উঠবার আগের স্নিগ্ধ আলো।

জীবনের বিচিত্র শব্দের ছাপা মন্ত্রে ডুবে গিয়েছিল মরণের ব্যথার নীরবতা।

তারপর ছ' মাসের মধ্যে জগদীশের কুঁড়েতে বই জমেছে শ' পাঁচেক।
তিন-চার খানা আস্ত দৈনিক খবরের কাগজ তার কুঁড়েতে পৌঁছায়—অনিয়মিত ভাবে। তবে পৌঁছায়।

কী তাড়াতাড়িই যে নাম ছড়ায়। কী ভাবে যে বেড়ে চলে ভক্তের ভিড়।
প্রবোধ প্রায় নির্জন দেখে গিয়েছিল বন্ধুর কুঁড়ে—এক বছর পরে সেই কুঁড়ে ঘরের কাছে তোলা নতুন প্রকাণ্ড আটচালাটা ছুটির দিন ভক্ত সমাগমে জনাকীর্ণ হয়ে থাকে!
আটচালাটা প্রতাপ করে দিয়েছে। জগদীশ থাকে তার আদিবাসীদের ছোট ভাঙ্গা কুঁড়েটাতেই।
অন্য প্রসঙ্গে ছাড়া ধর্মের কথা ভক্তি-বিশ্বাসের কথা বলে না। চমকপ্রদ অথবা মর্মগ্রাহী কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করে না। যখন যে মেজাজে থাকে সেই মেজাজে যা মনে আসে তাই বলে অথবা চুপ করে থাকে, যেমন খুশি ব্যবহার করে সকলের সঙ্গে। নেশার জের টানা মেজাজটা বিগড়ে থাকলে সকলকে ধমকে গালাগালি দিয়ে কিছু আর রাখে না।
তার ধমক-ধামক গালাগালি সহরের ভদ্র পদস্থ ধনী ভক্তরা পর্য্যন্ত মাথা নত করে মেনে নেয়। আরও ভক্ত বেড়ে যায়।
প্রথমে জগদীশ ব্যাপারটা একেবারেই বুঝতে পারে নি।

সে যোগীও নয়, সাধকও নয়! বরং অতি অপদার্থ মানুষ।
সে তো শুধু চিত্রার জন্যে নিজের অসহনীয় মনোবেদনা নিয়ে কাতরায়, নিজেকে অভিশাপ দেয়, সোজাসুজি আত্মহত্যা করতে পারে না বলেই বেপরোয়া নেশা চরমে তুলে চব্বিশ ঘণ্টার অর্দ্ধেকের বেশী সময় ব্যথাবোধের শক্তি হারিয়ে দিন কাটিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মরে যেতে চায়—সচেতন থাকার সময়টুকু শুধু আবোল তাবোল এলোমেলো চিন্তা করে।
তবু কেন এত প্রত্যাশা নিয়ে এত মানুষ তার কাছে আসে ?
শুধু এই প্রশ্ন নয়।
জগদীশ সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে যায় এই ভেবে যে মানুষের সমাজ ত্যাগ করে নির্জন অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে একা থাকার জন্য, অথচ মানুষ এসে ভিড় করে তার নির্জনতা ভঙ্গ করলেও তার খারাপ লাগে না।
বিকালের দিকে সে অবশ্য ভাগিয়ে দেয় ভক্তদের। সন্ধ্যাবেলা এখানে কারো থাকার অধিকার নেই।
রাত্রে বাঘ আসে, অন্য হিংস্র জন্তুরাও আসে—ওই খোলা আট-চালায় কারো রাত কাটানো চলবে না।
জগদীশের ভয় নেই, তাকে বাঘে খেলেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু সে অন্য কারো প্রাণরক্ষার দায় নিতে পারবে না।
এ বিষয়ে এমনি কঠোর জগদীশ, এমনি নিষ্ঠুরের মত সে বিকাল হতেই সকলকে খেদিয়ে দেয় যে ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকী থাকে না তার ভক্তদের !

সন্ধ্যা থেকে সুরু হবে যোগসাধনা। তাদের মত অধম ব্যক্তিদের জন্য সারাটা দিন দিতে পারে কিন্তু যোগসাধনায় তো ব্যাঘাত ঘটাতে পারেন না—তাদের জন্যই তো যোগসাধনা!

ভক্তেরা নিজেরাই তার নিয়মের মর্য্যাদা রাখে। দু'একজন বিভ্রান্ত বদ লোক রাত্রে জগদীশ কি করে সচক্ষে দেখতে চাওয়ার অদম্য কৌতুহলে চালাকি করে থেকে যাবার চেষ্টা করলে তারাই তাকে শায়েস্তা করে সঙ্গে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর দশ বার জন বুনো মানুষ এসে জগদীশের কুটিরের সামনে জড়ো হয়—তাদের আদিম অস্ত্রশস্ত্রগুলিও নিয়ে আসে।

শীতের রাত্রে আগুন জ্বালায়।

গ্রীষ্মের রাতেও আগুন জ্বালাবার ব্যাবস্থাটা রাখে।

শুকনো গাছ পাতা ডালপালা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে বাঘ ভালুক হিংস্র পশুরা শুধু যে ভয়ে দূরে পালিয়ে যায় তা নয়, কয়েকদিন আর এদিকে ঘেঁষে না।

তারা কিছু জানতে চায় না, কিছু বুঝতে চায় না। এই পৃথিবী এই জীবন সার কি অসার, মায়া কি বাস্তব, জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের আসল মানেটা কি—এসব কোন জিজ্ঞাসা তাদের নেই।

নেশা চড়িয়ে জগদীশ একা অন্ধকারে বিপজ্জনক পথ ধরে জলপ্রপাতে যায়, পাথরের গায়ের কত শত বছরের শ্যাওলা ধরা পিছল পাথরে নির্ভয়ে অনায়াসে পা ফেলে এগিয়ে যায়, প্রমত্তা প্রপাতের জলধারা দু'হাতে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় ঢালে।

বাঘ তাকে খায় না। ধারে কাছেও ঘেঁষে না।

তার পা পিছলে যায় না—এমন চড়াই-বড়াই মেশান নেশা করেও।

মাঝরাত্রি পর্য্যন্ত চুপচাপ একটা পাথরে বসে থেকে আবার নিরাপদে কুঁড়েতে ফিরে আসে।

এই দেবতা এসে এই কুঁড়েতে ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছে বলেই তো এবার শিকার মিলছে ভালো, ফসল ফলছে ভালো।

সহর থেকে বাবুর দল ভিড় করে এসে কত কিছু কিনে তাদের কত বাড়তি পয়সা দিচ্ছে।

দেবতার ঘরের সামনে দশ বার জনকে পাহারা দিতেই হবে।

দেবতা কৃপণ নয়।

চোলাই আর মহুয়া রস জিরাইকে দিয়ে যথেষ্ট সরবরাহ করে, তাদের সাধ মিটিয়েই করে।

এ অবস্থায় একদিন সন্ধ্যার পর রত্নাকরের একেবারে কুটিরের মধ্যে ঢুকে পড়া কি করে সম্ভব হল জগদীশ প্রথমে বুঝতে পারে না। ঠিক পাগলের মতই চেহারা। উস্কো খুস্কো চুল, মুখে তামাটে রঙের তরুণ বয়সে অপক্ক অল্প গোঁফ-দাড়ি, ধবধবে ফর্সা কলারযুক্ত একটা সার্ট এবং হাফ প্যাণ্ট।

জগদীশ রেগে উঠে শান্তির বিঘ্ন করার জন্য তাকে ধমকাতে যাবে, সে বোতাম খুলে সার্টের কলারটা ঢিল করে দিতে দিতে বলে, একটা বই দিতে এসেছি, আমার নিজের লেখা, একটা কবিতার বই।

নেশা তখনো মাথায় চড়েনি।

বিচার বিবেচনা জগৎ সংসার লোপ পায় নি ক্লান্ত আত্মার আত্ম-সম্মোহনের বীভৎসতায়।

জগদীশ বলে, বই ?

রত্নাকর বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নিজের লেখা একটা কবিতার বই। আপনাকে উপহার দিতে এসেছি।

প্রণামী নয়!

উপহার!

একটা ভয়ঙ্কর কবিতার বই লিখেছে স্পিড-উন্মাদ তরুণ, নিজেকে সে নাস্তিক বলে ঘোষণা করে, তবু সেও প্রণাম করেই বইটা তার পায়ের কাছে রেখেছিল।

জগদীশ মিনিট তিনেক গুম খেয়ে থাকে।

চেতনাকে মন্ত্রবলে আত্মস্থ করার সবচেয়ে তেজী আর জোরালো মেশানো নেশার বাঁশের চোঙ্গাটার দিকে চেয়ে কয়েকমুহূর্তে কত কথাই যে ভাবে জগদীশ, কত কিছুই যে অনুভব করে হৃদয় দিয়ে।

তাপ্পি নীরবে কুঁড়েতে এসে দামী বিলাতী আর দেশী মদের বোতল দুটো তার পাশে মেঝেতে নামিয়ে রাখে।

পাগল আগন্তুক তাকিয়েও দেখে না তাপ্পির দিকে।

দেশী মদের গালা আঁটা সোলার ছিপি খুলে তাপ্পিই লাগিয়ে দিয়ে যায় বিলাতী বোতলের কর্কের ছিপি।

বোতল তুলে ছিপি খুলে অনেকটা নির্জলা সরাপ জগদীশ গলায় ঢেলে দেয়।

কয়েকবার হিক্কা ওঠে। কয়েকবার সে কাসে।
তারপর সে বলে, কী চাও?

ঃ একটু শান্তি চাই।

ঃ তুমি জান না সন্ধ্যার পর আমি কারও সঙ্গে কথা বলি না?

ঃ জানি!

ঃ সন্ধ্যার পর ওরা তো কাউকে আসতে দেয় না আমার কাছে? তুমি কি করে এলে?

ঃ ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এসেছি। একটু বানিয়ে বললাম আমি আপনার গুরুভাই—গুরুদেবের হুকুমে জরুরী কথা বলতে এসেছি।

রত্নাকর একটু হাসে। তার রুক্ষ মলিন মুখে এমন মরিয়া আর বেপরোয়া দেখায় হাসিটা।

ঃ কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? এভাবে আমার সঙ্গে দেখা করার মানে?

পেটে অনেকখানি কড়া ওষুধ পড়েছে, সবে সুরু হয়েছে ক্রিয়া। এবার খানিকটা উদার মনে হয় জগদীশকে।

ঃ ওই যে বললাম, একটু শান্তির খোঁজে এসেছি। প্রাণে বড় যন্ত্রণা—যদি কোন উপায় করে দিতে পারেন। আপনি যোগী মানুষ, জ্ঞানী মানুষ—আপনার হয়তো জানা থাকতে পারে।

ঃ প্রাণে কিসের যন্ত্রণা, কেন যন্ত্রণা খুলে বলো! শুধু নাম বললে রত্নাকর—

: ওটা বানানো নাম। আমার কোন নামও নেই, পরিচয়ও নেই। আমি একটা ভবঘুরে—তিন বছর ধরে শুধু একটু শান্তির জন্য পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি মহাপাপী, এটাই আমার একমাত্র পরিচয়।

: কি পাপ করেছ ?

: দুটো মানুষকে খুন করেছি। একটি নির্দ্দোষী মেয়ে আর একটি ছেলেকে। মেয়েটাকে আমি ভালবাসতাম।

জগদীশ হঠাৎ বজ্র গর্জনে ফেটে পড়ে: আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসেছো ? তামাসা করতে এসেছো ? জানো আমি হুকুম দিলে ওরা তোমায় টুকরো টুকরো করে কেটে জংগলে পুঁতে ফেলবে ?

রত্নাকর ভয় পেয়েছে মনে হয় না। সে শুধু একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই জগদীশের ক্রোধে বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে চলে, এত চটবার কারণ কি হল ?

জগদীশ গর্জন করেই বলে, আমি বুঝিনি ভেবেছ ? চেনা লোক কার কাছে আমার কথা সব শুনে একটু ইয়ার্কি মারতে এসেছ, বুঝি না আমি ?

রত্নাকর খানিকক্ষণ হতভম্বের মত চেয়ে থাকে।

: আপনার ব্যাপার জেনে তামাসা করতে এসেছি ? আপনিও কোন মেয়েকে ভালবাসতেন নাকি ? না বুঝে না জেনে জেলাসিতে হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে তাকে খুন করেছিলেন নাকি ?

জগদীশ গুম খেয়ে থাকে। ভাবে, জিরাইদের ডেকে বজ্জাতটাকে বেঁধে রাখতে বলবে?

চিত্রার ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে সত্যিই তামাসা করতে এসেছে কিনা কাল দিনের বেলা সাদা চোখে সেটা যাচাই করে স্থির করবে ওকে নিয়ে কি করা উচিত?

রত্নাকর আবার তার মরিয়া বেপরোয়া হাসি হাসে।

ঃ এতো বেশ যোগাযোগ হয়েছে! যোগী আর ভবঘুরের যোগাযোগ। প্রিয়াকে খুন করে আপনি হয়েছেন যোগী আর আমি হয়েছি ভবঘুরে।

জগদীশ হঠাৎ সুর পাল্টায়, নরম সুরে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলছ আমার সঙ্গে তামাসা করতে এসোনি?

রত্নাকর আপশোষের আওয়াজ করে বলে, এসময় এভাবে এমন সময়ে এরকম তামাসা করতে কেউ আসে? যে কবিতা লেখে, আর বন্ধু নিজের খরচে ছদ্মনামে যার কবিতার বই ছাপিয়ে দেয়? পাক খেতে খেতে এদিকে এলাম, শুনলাম একজন অল্পবয়সী সিদ্ধযোগী অনেক পাপী-তাপীকে শান্তি দিয়েছেন। ভাবলাম দেখেই আসি, এঁর কৃপায় যদি একটু শান্তি পাই।

রত্নাকর জোরে জোরে মাথা নাড়ে। এতক্ষণের আপনি বলাটা হঠাৎ তুমি বলায় পরিণত করে বলে, না দাদা, তোমার কাছে কোন আশা নেই। তোমার দ্বারা হবে না। তোমার নিজের জ্বালাই এখনো সামলাতে পারো নি, আমার জ্বালা তুমি জুড়োবে!

সত্তর বছরের প্রতাপকে জগদীশ প্রথম থেকে তুমি বলেছে, প্রতাপ তাকে মনে প্রাণেও তুমি বলার কথা ভাবতে পারে নি। গেলাসে খানিকটা রঙীন মদ ঢেলে জগদীশ গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বলে, হবে ?

ঃ নাঃ। ওসব সস্তায় কিস্তিমাতের ধার ধারি না। প্রাণের আগুন চাপা দিলে কি নেভে ? ধুকে ধুকে আরও বেশীদিন জ্বলবে, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালচে মেরে যাবে প্রাণটা। চিতা জ্বলতে দেওয়াই ভাল। দাউ দাউ করে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে নিভে যাবে।

ঃ প্রাণটাকেও পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যাবে তো ?

ঃ প্রাণ কখনো পোড়ে ? সোনার মত যত পোড় খায় তত খাঁটি হয়। তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে কালচে মেরে পোড়ার চেয়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া ভাল।

ঃ পাগল হওয়া ?

ঃ অনেকদিন ধরে পাগল হতে হতে আরও দশজনকে পাগল করার চেয়ে সোজাসুজি পাগল হয়ে যাওয়া ঢের ভাল। নিজের বিষটা নিজেই ভোগ করলাম। আমার জ্বালাটা আমারি রইল।

ঃ আমি কিন্তু কাউকে ডাকিনি। লোকে যেচে এসে ঝনঝাট করলে আমি কি করব ?

ঃ ডাকোনি ? সব কিছু ত্যাগ করে বনে এলে, সবাইকে ডাক দিলে না যে ছাখো আমার কাণ্ড কারখানা ? আয়

'আয় তু-তু' করে ডাকটাই বুঝি একমাত্র ডাক? অন্যভাবে ডাকাডাকি নেই জগতে?

ঃ আমার ব্যাপার জানো না তাই—

ঃ তোমার ব্যাপার বুঝতে পারছি বৈকি। আমি নিজের হাতে প্রিয়াকে খুন করে হয়েছি ভবঘুরে, তুমি যোগী হয়েছ তোমার জন্য তোমার প্রিয়াকে খুন করতে হয়েছে বলে।

মাথা ঘুরছিল জগদীশের। দেশী বোতলটার দিকে হাত বাড়িয়েও সে হাত গুটিয়ে নেয়।

হাঁক দিয়ে জিরাইকে ডেকে আনে।

মেশালো বুনো ভাষায় জানায়, গুরুভাই-এর থাকার ব্যবস্থা করে দাও। কোন কষ্ট যেন না হয়।

মহুয়ার খাঁটি গেঁজানো রসের চোঙাটা হাতে নিয়ে জগদীশ এগিয়ে যায় জলপ্রপাতের দিকে।

পাহাড়ের গা বেয়ে জলের ধারার হঠাৎ অনেক নীচে ঝাঁপিয়ে আছড়ে পড়ার আওয়াজ চব্বিশ ঘণ্টাই শোনা যায়।

যত কাছে এগোনো যায় ততই যেন গর্জন বাড়ে ঝরণায় আছাড় খাওয়ার।

প্রকৃতি যেন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে প্রকৃতিজয়ী তাকে পরাজয় মানাতে চাইছে।

ঝাঁপিয়ে পড়বে? নিমেষে শেষ করে দেবে বাঁচার কষ্ট? মিশে যাবে চিত্রার সঙ্গে একাকার হয়ে?

ঝাঁপ সে দিতে পারে অনায়াসেই। মরণ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে জীবন-মরণের ছেলেখেলার মতই।

কিন্তু কোন মানে হবে কি এভাবে মরার? মরে গেলে সব ফুরিয়ে যায়, চুকে যায় বাঁচা-মরার হিসাবনিকাশ, শূন্যে মিশিয়ে যাবার পর জল বায়ু আকাশ পৃথিবীতে মিশে যাবার পর জগতে ঘটে চলবে প্রকৃতি আর জীবনের ইতিহাস, মানুষ আর প্রকৃতির একটানা লড়াই. কিন্তু অসংখ্য মৃতের মত সেও মিলিয়ে থাকবে চেতনাহীন মহাশূন্যে।

জীবন থাকবে পৃথিবীতে।

প্রপাতের জলস্রোতে ঝাঁপ দিলে কয়েক মিনিটে সে চিত্রার মতই মিলিয়ে যাবে ওই আদিম উপকরণে।

এখনো সে জীবন্ত।

চিত্রা মরেছে।

মরণের চেয়ে বড় সত্য জীবনের জানা নেই। মরব জেনেই বাঁচা। মরে মরে মরাকে জয় করে বাঁচাই জীবনের ধর্ম।

যত ভক্ত আসে যায়, এসেছে গিয়েছে, তাদের স্মরণ করে মাথায় হাত দিয়ে জগদীশ সেই পাথরে বসে পড়ে যে পাথর থেকে হঠাৎ তাকে দেখে দু'পা পিছু হঠতে গিয়ে চিত্রা শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল।

নেশার ঝোঁকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরে চিত্রার সঙ্গে শক্তি জলবায়ু মাটিতে একাকার হতে চেয়েও জগদীশ ভুলতে পারে না সে জীবন্ত।

মরণকে জয় করে চলাই হল জীবন।

জীবন আর কিছুই নয়।

সে জীবন্ত। এই জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিয়ে সে মরণজয়ী জীবনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

মৃত্যুর হিসাবে পাপ পুণ্য সমান, বিশ্বাস রাখা আর বিশ্বাস-ঘাতকতাও সমান। দুই বিপরীতের সংঘাতই জীবন, জগতে মরণ বাঁচন।

সে জীবন্ত।

বাঁচার চেষ্টাই তার চরম সার্থকতা—পিঁপড়ে থেকে মানুষের বাঁচার চেষ্টাই একমাত্র ধর্ম।

জীবাণু বীজাণুও যে জীবন জগদীশ তা জানত। কিন্তু সে ভাবে অনুবীক্ষণে দেখা এই সূক্ষ্ম জীবনগুলিই কি শেষ কথা? এর চেয়ে সূক্ষ্মতর জীবন যে নেই তার প্রমাণ কি?

জীবন যেমন হোক, জীবনের স্থূল আর সূক্ষ্ম দিক খানিক খানিক জেনেছিল বলেই জগদীশ কিছুতেই সেদিন জলপ্রপাতের উপরের পাথর থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিত্রার সঙ্গে একাকার হয়ে ব্যথার পূজা সাঙ্গ করতে পারে নি।

সপ্তম অধ্যায়

বাইরের লোক হিসাবে ভবঘুরে রত্নাকরই সর্ব্বপ্রথম জগদীশের আশ্রমে ঠাঁই পেল।

শিষ্য হিসাবে নয়, ভক্ত হিসাবে নয়, আশ্রিত হিসাবেও নয়—একরকম অতিথি হিসাবে। এবং জগদীশেরই আমন্ত্রণে!

রত্নাকর মোটামুটি তার কাহিনী বলেছে। প্রেমের সেই চিরকেলে তিনকোণা ঝনঝাটের কাহিনী।

ভয়ানক ভাবপ্রবণ আর রাগী ছিল রত্নাকর। হঠাৎ আরেকজনের সঙ্গে মেয়েটার ঘনিষ্ঠতা দেখে মাথা গিয়েছিল বিগড়ে এবং দুজনকেই বিষ খাইয়ে খুন করেছিল।

খুঁটিনাটি জেনে দরকার নেই জগদীশের, দু'জনকে মারাত্মক বিষ খাওয়াবার সুযোগ সুবিধা ছিল বলেই বিষ খাইয়েছিল—নইলে অন্য উপায়ে খুন করত, হয় তো গুলি করে মারত।

ঃ ঠিক করেছিলাম নিজেও মরব, কিন্তু দাঁদা পারলাম না। কিছুতেই পারলাম না!

ঃ পাগল না হলে আত্মহত্যা করা যায় না। নইলে এত দুঃখ-কষ্ট সয়ে এত মানুষ বেঁচে থাকত?

ঃ পাগল তো হয়েই গিয়েছিলাম। নইলে ওদের মারতে পারতাম ?

ঃ অন্যকে মারতে পাগল হতে হয় না, হিংসা মাথায় চড়ে গেলেই মানুষ মারতে পারা যায়। একটা যুদ্ধে জগতে কত লোক খুন হয় জান না ?

ঃ যুদ্ধ আলাদা ব্যাপার। সৈন্যেরা তো নিজের নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে শত্রু মারে না।

ঃ ব্যক্তিগত স্বার্থেই যুদ্ধ বাধে। সৈন্যরা ব্যক্তিগত স্বার্থেই বাঁচার জন্য যুদ্ধে নামে।

ঃ বাঃ! এটা কিরকম কথা হল ? দেশ আক্রমণ করলে দেশ রক্ষার জন্য সৈনিক হয়ে যুদ্ধে নামলে সেটা হবে ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপার ?

ঃ হবে বৈকি। আমার দেশ বাঁচলে আমি বাঁচব—এই তো সোজা হিসাব। এখানে দেশের স্বার্থ নিজের স্বার্থ এক হয়ে গেল। শত্রুরাও মানুষ—কিন্তু তখন যত বেশী শত্রুকে খুন করতে পারব দেশকে তত বেশী রক্ষা করতে পারব। যুদ্ধের সময় যে সৈনিক যত বেশী শত্রু-মানুষ খুন করতে পারে তার তত বেশী গৌরব, নিজেরও তত বেশী অহঙ্কার।

সারাদিন ভক্তদের নিয়ে জগদীশ ব্যস্ত থাকে। রত্নাকরের সঙ্গে কথা সুরু হয় সন্ধ্যার সময়,—সারাদিন মহাপুরুষ হয়ে জীর্ণ দীর্ণ দুঃখী মানুষের ঝামেলা সামলে জগদীশ যখন জীবনের জীর্ণ পুরাতন সীসাকে নিমেষে সোণার বরণ ধারণ করাবার চেষ্টা শুরু করে।

বোতল আর গলায় কাত করে না জগদীশ।
সচেতন থেকে রত্নাকরের সঙ্গে কথা বলা চালিয়ে যাবার জন্য একটু একটু বিষ খায়, চুমুক চুমুক খায়।
সারা জগতের জীবন-সমুদ্র মন্থন করা বিষ এক চুমুক গিলে পেটে নিয়ে নীলকণ্ঠকে হার মানবার প্রয়োজন যেন তার ফুরিয়ে গেছে।
সেদিন সন্ধ্যাবেলা সবে জগদীশ সুরু করেছে নেশার পালা, আজ মেশান নেশা করবে না নেশা চড়াবে না এই ইচ্ছা নিয়ে, —জিরাই এসে খবর দেয় ললিতা তার দর্শন চায়।
লালিম বিলাতী মদ—কলসীতে এনে রাখা প্রপাতের জল অল্প একটু মিশিয়ে দিতে পাতলা হালকা দামী কাঁচের গেলাসে যেন রঙীন হয়েছে অমৃতের মত!
একটা চুমুক দিয়ে গেলাসটা সামনে নামিয়ে রেখে সে বলে, লে আ বেটিকো।
জিরাই এক গাল হাসে।
ললিতা কুঁড়েতে ঢুকে হাঁটু পেতে বসে গলায় আঁচল জড়িয়ে তাকে প্রণাম করতে যায়।
তাড়াতাড়ি তুলে না নিলে গেলাসটা উল্টে যেত!
এদিকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ললিতা প্রণাম করে, ওদিকে জগদীশ একনিশ্বাসে খালি করে দেয় গেলাসটা!
ললিতা মাথা তুলছে না দেখে মিষ্টি সুরে বলে, মা, ছেলেকে বাবা করে আজ মেয়ে হবার মতলব নিয়ে এসেছ?

ধীরে ধীরে মাথা তোলে ললিতা। ধীর শান্ত কণ্ঠে ললিতা বলে, হ্যাঁ, মেয়ে হয়েই বাবার কাছে এলাম—মতলব নিয়েই এলাম।

জগদীশ প্রসন্ন হাসি হেসে বলে. সেটা বুঝেছি। মুস্কিল আসানের মতলব না নিয়ে কেউ আসে না আমার কাছে। রোগ শোক দুঃখ বিপদ—আমি যদি সামলে দিতে পারি। যত বলি পারব না, ওসব আমার জানা নেই, তত বেশী চেপে ধরে —তত বেশী কাঁদাকাটা করে।

ললিতা সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার ওরকম সস্তা ভড়ং নেই। ওসব চেয়ে আপনাকে জ্বালাতন করতে আসিনি।

ঃ তবে ?

ঃ দেহটা নিয়ে পড়েছি মহা বিপদে। বিশ্বাস করুন, আমি জানতাম না। খাই দাই ঘুমাই, দিব্যি সুস্থ শরীর, বিয়ে হবার আগে টেরও পাইনি স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর সংসার করার সুখ আমার জন্যে সৃষ্টি হয় নি। জগতের ওসব সুখের জন্য আমার জন্ম হয় নি।

ঃ ও সব সুখ চাও না ?

ঃ চাই না ? চেয়ে চেয়ে পাগল হয়ে যেতে বসেছি। দেহটা জানিয়ে দিয়েছে ও সুখ আমার কপালে নেই।

ঃ মা হতে চাও না ?

ধৈর্য্য হারিয়ে ললিতা চীৎকার করে ওঠে, হাজারবার মা হতে চাই, হাজারবার হতে চাই।

ঃ তবে ?

ললিতা খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে থাকে।

এই নাকি নমুনা অসীম জ্ঞানী পরম সাধক মানুষটার ?

এভাবে এসে এত কথা বলার পরেও বুঝতে পারছে না তার আসল কথা ?

অথবা বুঝেও ভান করছে না-বোঝার ?

সে তো একা নয়।

তার মত অনেকের কথা শুনতে হয় বুঝতে হয়।

স্পষ্ট করে সে বলেনি তার বিপদের কথা, আভাষে ইঙ্গিতে বলেছে। ধরে নিয়েছে একটু ইঙ্গিত দিলেই মহাপুরুষ বুঝে নেবেন তার আসল সমস্যা !

মাথা না তুলেই মৃদুস্বরে ললিতা বলে, পরশু উনি আসবেন লিখেছেন। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আমার দেহে খুঁত আছে উনি জানেন না, বোঝেনও না। আমিও জানতাম না বিয়ের আগে। এখন জানতে বুঝতে দিতে সাহস হয় না—ভাববেন আমি ঠকিয়েছি ! কী করে বসবেন কে জানে ! আমি কি করব বলে দিন—আমায় বাঁচান।

জগদীশ গভীর স্নেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, সে যেন ছোট কচি মেয়ে এমনিভাবে তার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, হ্যাঁ, তোকে বাঁচাব। তুই ভীরু নোস, লাজুক নোস, ঢং করিস না—তোকে না বাঁচালে চলে !

ঃ কি করব ?

ঃ আলোক তোকে ভালবাসে ?

ঃ ভীষণ ভালবাসে।

বিপন্না বিষন্না ললিতার মুখে ভালবাসার 'ভীষণ' বিশেষণ জগদীশকে হাসায় না। তাপ্পি যথাসময়ে তার নেশা আর খোরাকের আয়োজন করে দিতে এলে সে গর্জন করে বলে, ছুটি দিইনি তোকে ? বলিনি ছেলে বিইয়ে গায়ে জোর পেলে কাজে আসবি ? ঘরে বসে মাইনে পাবি ?

তার ধমকে বিশেষ কাবু হয় না তাপ্পি।

এত তাড়াতাড়ি কোনদিন নেশা চড়ায় নি, এত বেশী বিলাতী মাল গেলে নি। নেশা যেন পলকে পলকে লাফ দিয়ে দিয়ে চড়তে থাকে। আসন্ন মাতৃত্বের ভারে তাপ্পির নড়াচড়া মন্থর হয়েছে। ধীরে ধীরে সে টুকিটাকি কাজগুলি সারে—রাত্রে জগদীশের যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখে। আজ শুধু বিলাতী খাচ্ছে দেখে মায়ের মত স্নেহের সুরে জিজ্ঞাসা করে, মাংস খাবি বাবা ?

মাথা নেড়ে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে জগদীশ ললিতাকে বলে, আমি তোকে পরীক্ষা করব।

ভীতা স্তম্ভিতা ললিতা চেয়ে থাকে !

ঃ ভয় কি ? লজ্জা কি ? ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার পরীক্ষা করবে না ?

ডাক্তারের মত তাকে পরীক্ষা করবে ! ভয়ে ললিতা যেন কুঁকড়ে যায়।

তাপ্পিকে যেভাবে ধমক দিয়েছিল প্রায় সেইভাবে ধমক দিয়ে জগদীশ বলে, আমাকে তুই মানুষ ভাবিস, পুরুষ ভাবিস ? আমাকে তুই ভয় করিস ! আমার কাছে তোর লজ্জা !

ললিতা উঠে দাঁড়ায়। কাতর কণ্ঠে বলে, আমি আজ যাই বাবা।

জগদীশ গর্জন করে ওঠে, না যেতে পাবি না। আমাকে তুই ঠকিয়েছিস, গেঁয়ো মেয়ের চেয়েও বোকা-হাকা লাজুক হয়েও দেখিয়েছিস তুই কড়া মেয়ে, শক্ত মেয়ে। লজ্জায় ভয়ে এতকাল একটা রোগ পুষে রেখেছিস মুখ বুজে। তোর লজ্জা ভয় ভেঙ্গে দেব আজ। তোর রোগ সারিয়ে দেব।

ভীতা চকিতা হরিণীর মত ছুটে পালাতে গিয়ে কুঁড়ের বাইরে দাঁড়ানো রত্নাকরের গায়ে ধাক্কা লেগে আছাড় খেয়ে ললিতা পড়ে যায়।

কুঁড়েটা জলপ্রপাতের ধারে হলে সেও চিত্রার মতই জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নীচে আছড়ে পড়ত।

আঘাত লেগে ললিতা অজ্ঞান হয় নি, মূর্চ্ছা গিয়েছিল।

দ্বিধামাত্র না করে রত্নাকর তাকে তুলে কুঁড়ের মধ্যে নিয়ে যায়, মাটির মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে মাথায় জল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, তাপ্পি, কটা মেয়েকে ডেকে আন চটপট। মেয়েছেলে ঘিরে আছে দেখে ভরসা পাবে।

আট ন'জন নানা বয়সের নিকষ কালো বুনো মেয়েমানুষ রত্নাকরের ইঙ্গিতে কুঁড়ের মেঝেতে বসে, আরও কয়েকজন

দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মূর্চ্ছা ভেঙ্গে যায় ললিতার। উঠে বসে সে বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়! রত্নাকর হেসে বলে, তুমি এত ভীতু কেন গো বোন?

খুব তাড়াতাড়িই মূর্চ্ছাভঙ্গের বিহ্বলতা কেটে যায়। নিজেকে এখানে এ অবস্থায় দেখে তাড়াতাড়ি মনে পড়িয়ে নিতে হয় সব কথা।

ললিতা মাথা হেঁট করে।

রত্নাকর এবার অনুযোগ দিয়ে বলে, এত ভক্তি কর বাবাকে, বাবার নিয়ম-নীতির খবর রাখ না? কত আট-ঘাট বেঁধে বাবা বিষ খায় জান না?

ঃ আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ঃ কি করে বুঝবে? বাপকে চিনবে না, বাপের রীতিনীতি জানবে না, আসবে শুধু আবদার জানাতে। বাপকে রাগিয়ে দেবে, বাপের উগ্রমূর্তি দেখে মূর্চ্ছা যাবে।

ললিতা চুপ করে থাকে।

রত্নাকর ধমকের সুরে বলে, বাবার হুকুমে আমরা একজন দু'জন সন্ধ্যা থেকে সারারাত দুয়ারের কাছে পাহারায় থাকি জানা তোমার উচিত ছিল। বাবা নিজে হুকুম দিয়েছে—কড়া হুকুম। যে মানবে না তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না বাবার। বিষ খেতে খেতে মাথা বিগড়ে গেলে, বিভ্রম ঘটলে, বাবাকে যেমন করে হোক সামলাতে হবে। মারবার হুকুম আছে, বেঁধে রাখার হুকুম আছে।

কে জানে জগদীশ কিছু শুনছে কিনা, তাদের দিকে চাইছে কি না! মশগুল হয়ে অন্য কথা ভাবতে ভাবতেই সে যেন বিলাতী মদের বোতলটার পাশে সাজানো তাড়ির হাঁড়িটা টেনে নিয়ে হাঁড়ির কাণায় মুখ দিয়ে পান করে। তালের গেঁজানো রসে তার বুক ভেসে যায়।

একনজর তাকিয়ে দেখে রত্নাকর বলে যায়, বাবা কি জানেন না বিষের মজা? নিজেই তাই পাহারা বসিয়েছেন। বিষের ঝোঁকে খারাপ কিছু করতে গেলে যেভাবে পারি ঠেকাবার হুকুম দিয়েছেন! বলেছেন কি জানো? বলেছেন, দরকার হলে মেরে ফেলবি!

হেঁট করা মাথাটা নীরবে জগদীশের পায়ের কাছে মাটিতে ঠেকিয়ে ললিতা নীরবে উঠে দাঁড়ায়।

সে কিছু বলে না, তবু রত্নাকর সঙ্গে গিয়ে তাকে রাস্তায় গাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে।

ঃ রত্নাকর! মাতাল হয়েছি?

ঃ মাতাল? এই তো সবে সুরু করলে—এইটুকু খেয়ে মাতাল হবে তুমি? পাঁড় মাতালদের অবিশ্যি এক একদিন একটুখানি খেয়েই ক্ষেপে যেতে দেখেছি—ওটা ব্যারাম। রোগটার কি যেন নাম বলে ডাক্তাররা—হঠাৎ হয়। দিব্যি কথা কইছ, মাতাল হতে যাবে কেন?

জগদীশের মুখের ভাব প্রসন্ন এবং প্রশান্ত।
ঃ আজ খানিকটা বুঝতে পারছি মানুষ নেশা করে কেন। শুধু বিষ দিয়ে বিষ ঠেকানো নয়। আগে তাই খেতাম প্রাণের জ্বালা চাপা দিতে। এখন খাই দায় ঠেকাতে। এত কিছু চাইছে মানুষ—ছুটকো ভাবনা চিন্তা বিচার বিবেচনা কাটিয়ে না উঠে চাহিদা মেটাতে পারি না।
তাকে উপলক্ষ করে নিজের সঙ্গে কথা কইছে জগদীশ। আত্ম-চিন্তা মুখে উচ্চারণ করছে।
উৎফুল্ল হয়ে রত্নাকর জেঁকে বসে।
ঃ যেমন ধর ললিতার এই ব্যাপারটা। নাঃ, বেঠিক কিছু বলিনি, বেঠিক কিছু করি নি। বেটিকে ঠিক এরকম একটা শক্ দেওয়া দরকার ছিল। বাপ ভাই স্বামী আছে, মা মাসী শাশুড়ী বৌদি বোন আছে, ননদ আছে, সবার কাছে এতকাল গোপন করে রেখেছে রোগটা—চুপি চুপি আমার কাছে এসেছে রোগ সারাতে। ভড়কে দিয়ে ঠিক করেছি। প্রতাপ আর আলোককে ধমকে দিলেই বেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।
কিন্তু রত্নাকর—রত্নাকর মুখ খোলে না।
ভাবতে ভাবতে জগদীশ আপনমনে বলে, কোথায় একটা ভুল হচ্ছে, ধরতে পারছি না। জানিস, মনে হচ্ছে, আমায় একদিন নেশা ছাড়তে হবে। সংসার স্পেশাল বাপ বানিয়েছে, এ বাপের দায় থেকে আমার রেহাই নেই।
রত্নাকরও তাই বলে।

বলে, দাদা, সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেই কি সংসার রেহাই দেয়? সংসারটাই তো তোমায় সন্ন্যাসী করেছে। তোমার একটা বিশেষ গুণ আছে, ক্ষমতা আছে—খাপছাড়া পাগল মানুষ তুমি। সংসার বলে, সংসারে মানিয়ে চলতে পারছ না, তুমি তবে সংসার ছেড়েই যাও। খুঁটিনাটি দায় থেকে রেহাই নিয়ে ভাববে যাও ব্যাপারটা কি। আমরাও বুঝতে চাই ব্যাপাব—আমাদের চিন্তা করার সময় কই, ভালমন্দ সবকিছু ঘাঁটবার সুযোগ কই? সংসারের মজাতেই মজে আছি দিনরাত। তুমি যাও, নিজের খুশিমত মন্দির থেকে আঁস্তাকুড় চষে বেড়াও, অমৃতের সঙ্গে বিব খাও, বনে গিয়ে চিন্তা কর—তোমার ছুটি মঞ্জুর। কিছু কিছু যখন জানতে বুঝতে পারবে, আমাদের জানিয়ে দেবার বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কোরো!

ঃ চিন্তা করার চাকর?

ঃ চাকর নয়—দায়িক। সংসারের দরকারের দায়টা মেনেছ বলেই না এই জঙ্গলে যেচে এলেও তোমার খাঁটি বিলেতী মালের পয়সাটা জুটে যাচ্ছে।

সুদর্শনাও অন্যভাবে এই কথা বলেছিল। শুনে রেগে গিয়েছিল জগদীশ।

রত্নাকর গুরুর মত বলে: দায় না নিলে, ফাঁকি দিতে চাইলে, ঝোলা কাঁধে ভিক্ষে করতে বার হতে হত।

ঃ আমার তবে বুজরুকি নয়?

ঃ আরে বাসরে! এমনভাবে লোকে বুজরুকি চালায়?

এমন যায়গায় এসে ডেরা বেঁধে শুধু চিন্তা ভাবনা নিয়ে মেতে থেকে ?

ঃ নেশা ভাং তো করি ?

ঃ তোমার খুশি হয় কর! আর সব তো ত্যাগ করেছ— এভাবে যে বেশীদিন বাঁচবে না সে ভাবনাটা পর্য্যন্ত! তুমি নেশ্রা করলে লোকের কি ? জগৎ সংসার তলিয়ে বোঝার চেষ্টা নিয়ে দিবারাত্রি মেতে আছ, লোকের কাছে তাই যথেষ্ট।

আজ খেয়াল করে জগদীশ একটু আশ্চর্য্যই হয়ে যায় যে

খোলাখুলি আলাপ আলোচনার মধ্যে ক্রমে ক্রমে রত্নাকরের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা কতখানি বেড়ে গেছে। বিনা দ্বিধায় রত্নাকরের সঙ্গে নিজের সম্পর্কে যেসব কথা নিয়ে আলাপ চালায়, কোন ভক্তের কাছে ওভাবে ওসব প্রসঙ্গ তোলার কথা সে ভাবতেও পারে না।

ভক্তদের ভক্তি টুটে যাবার আশঙ্কায় কি ? রত্নাকরের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে নিজের সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ চালাতে পারার আগে এ প্রশ্ন মনে এলে জগদীশের মুস্কিল হত। নিজের মধ্যে ভক্তদের ভাঁওতা দিয়ে ভুলিয়ে রাখার হীনতা কল্পনা করে বিব্রত হয়ে পড়ত।

রত্নাকরের সঙ্গে অন্য ভক্তদের তুলনা করে সে বুঝতে পেরেছে যে জেনেশুনে ভাঁওতা সে কাউকেই দেয় না। ভক্তদের কাছে এসব কথা সে এইজন্য বলে না যে ভক্ত যতই বিজ্ঞ আর

বুদ্ধিমান হোক, এসব কথার মর্ম তারা বুঝবে না, এলোমেলো উল্টোপাল্টা মানে করে নিজেরা শুধু বিব্রত হবে।

কাউকে সে ভক্ত হতে ডাকে নি, কারো কাছে কোনদিন নিজের অলৌকিক ক্ষমতার ভাণ করেনি।

তার কোন গোপনীয়তা নেই, নিজে সে যেমন মানুষ তেমনি ভাবে সকলের সামনে আসে। তবু ওরা তাকে ভক্তি-করে বলেই ওদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য তার আত্মবিচারে বেচারাদের টেনে নামানোর কোন মানে হয় না।

জগদীশ খানিকক্ষণ রত্নাকরের দিকে চেয়ে একটু ভাবে। রত্নাকর অনেক বোঝে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাকেও আশ্চর্য্য-রকমভাবে বুঝে নিয়েছে।

কিন্তু সে যা বলতে চাইছে তার আসল তাৎপর্য্য কি বুঝবে রত্নাকর?

অন্য কেউ হলে কথা ছিল, রত্নাকর তার বক্তব্য ঠিকমত ধরতে না পারলেও অবশ্য আসবে যাবে না।

ঃ আমি কিন্তু শুধু নিজের চিন্তাই করেছি বরাবর, কোন বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

রত্নাকর একটু হাসে।

ঃ তোমার বিনয় সত্যি বৈষ্ণব-মার্কা দাদা! এখানে একলাটি এতকাল শুধু নিজের কথাই ভেবেছ? নিজের কোন কথাটা ভেবেছ? আমি কে, আমি কি, আমি কেন, আমি কোথায় —এসব কথা?

রত্নাকর আবার একটু হাসে।

ঃ নিজেকে নিয়ে যেখান থেকে যে কথা ভাবতে সুরু কর—সংসার এসে যাবেই। আমি কে ভাবতে গেলেও ভাবতে হবে মানুষ কে! আমি একটা মানুষ এখান থেকেই তো ভাবনা সুরু করতে হবে? মানুষ কে না ভেবে কারো বাপের সাধ্যি আছে পাঁচ মিনিট আমি কে এই ভাবনা চালায়! সংসারে জন্মে ভাবতে শিখলে সংসারের কাছে—একলাটি আছো বলেই বুঝি জগৎ সংসারকে বাদ দিয়ে নিজের কথা ভাবতে পারবে? সমাজ, সংসার, জন্মমৃত্যু, সুখ দুঃখ ঈশ্বর,—নিজের কথা তলিয়ে ভাবতে গেলে সব এসে যাবে। পাপীরও এসে যাবে, সাধুরও এসে যাবে।

ঃ তুই এত জানিস, এত বুঝিস, তবু শান্তির খোঁজে এসেছিলি আমার কাছে!

ঃ অনেক জানলেই কি হয়? আসল জানাটা জানলাম কৈ! তুমি আমার চেয়ে অনেকগুণ বেশী জানো, এই কটা দিনে আমার কত ভুল-জানা যে শুদ্ধ করে দিয়েছ তার ঠিক ঠিকানা নেই! কিন্তু প্রথম দিনেই টের পেয়েছিলাম তুমি অনেক জানো বোঝ কিন্তু আসল কথাটা এখনো জানোও নি, বোঝও নি। মনে আছে বলেছিলাম, তুমি আমার জ্বালা জুড়োতে পারবে না—নিজের জ্বালায় তুমি নিজেই জ্বলছ!

জগদীশ হেসে বলে, সে কি সোজা জ্বালা রে? জ্বালার চোটে

পালিয়ে এলাম, নিজেকে ক্ষয় করে শেষ করব যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।

রত্নাকর বলে, দাদা, নিজেকে অত তুচ্ছ কোরো না। নিজেকে সীসা ভাব, অদ্ভুত দ্রাক্ষা রসায়নে সোনা হয়ে ওঠো। কিন্তু দাদা একটা কথা বোঝোনা কেন? তোমার কি শুধু দ্রাক্ষা রসায়ন, দেশী, চোলাই, মহুয়া, সিদ্ধি, গাঁজা দিয়ে সীসার নিজেকে সোনা ভাবার চোট্টামি?

প্রতিজ্ঞা করে সেদিন জগদীশ শুধু মদ খাচ্ছিল। মদের নেশাও মারাত্মক। কিন্তু মদের একটা গুণ আছে এই যে সীসার স্বার্থের পাল্লায় পড়ে সোনারও নিজেকে সীসা মনে করায় বিপদটা মদ ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

জগদীশ বলে, কিন্তু ভাই, আমি তো যোগসাধনাও করি না, ভগবানকেও ডাকি না। আমার কথা আমার ব্যথা কেউ বুঝবে না জগতে। তুমি তো জানই সব ব্যাপার। নিজের বোকামি পাগলামিতে এই জলপ্রপাতে চিত্রাকে বিসর্জন দিয়েছি বলেই এইখানে এই জঙ্গলের ধারে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দেবার জন্যে ডেরা বেঁধেছি। আত্মহত্যা করতে পারলাম না ভালবাসার জন্য আত্মহত্যা করলে ভালবাসাকেই সস্তা করে দেওয়া হবে বলেই পারলাম না। আমায় কেন এত লোক ভক্তি করে, ভালবাসে?

জিরাই তাপ্পি কিরপা এবং আরও দশ বারজন আদিম মানুষ

ভিড় করে আসে। তাপ্পি দুধ আর ফলমূলের ডেলাটা তার সামনে ধরে দেয়।

আজ তাদের সারারাত্রির উৎসব।

জিরাই জিজ্ঞাসা করে, বাবা তু যাবি ?

ঃ কেনে যাব নাই রে ?

সকলের খুশি যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকাশ পায়।

তারপর জগদীশ খানিকক্ষণ কি ভাষায় ওদের কি বলে যায় একটানা, রত্নাকর বুঝতে পারে না। সকলের ভাব দেখে টের পায় দেবতার কাছে এসে দেবতার কথা শুনে আরও বেশী খুশি হয়ে তারা তাদের আদিম অসভ্য উৎসবের আনন্দে মাততে চলেছে।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে জগদীশ লাল পানীয়ের কাঁচের পাত্রটা সরিয়ে রাখে। মাটির গেলাসে চোলাই ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে ফেলে।

লাল পানীয়ের কাঁচের গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে রত্নাকর বলে, আমিও শিষ্য হলাম, ভক্ত হলাম। এই কিন্তু প্রথম আর শেষ। নেশা আমার পোষায় না।

ঃ কেন ? খেতে বলেছি তোকে ? মাতলামি পাগলামি করলে তোকে কিন্তু আমি—

ঃ মেরে ফেলবে ? ওদের দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে বনে পুঁতে ফেলবে ? তাই যদি তুমি পারতে দাদা তবে পীরিতের খাতিরে এই বন-গাঁয়ে এসে আত্মসাধনা করতে না! আজ

ক'বছর চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, তোমার এই জঙ্গলে এসে আমিও ঠেকে যেতাম না।

অর্দ্ধ উলঙ্গ বুনো কালো মানুষগুলি একটা উৎসব করবে, তারই প্রস্তুতি চলছে। ওদের কত সামান্য উপকরণ লাগে সকলে মিলে নেচে গেয়ে উৎসব করার জন্য, অথচ কত খাটুনি দরকার হয় ওইটুকু প্রস্তুতির জন্যই!

শিকার করে এনেছে বনের একটা পশু, সেটাকে পোড়াবার আয়োজন চলছে। রত্নাকরের মাথায় ঝিলিক দিয়ে যায় যে এই অসভ্য মানুষগুলি জীবন্ত পশুকে কখনো আগুনে পোড়ায় না।

একটা নিশ্বাস ফেলে রত্নাকর বলে, বছর সাতেক ঘুরে ঘুরে কাটল, কত জ্ঞানী কত মহাপুরুষের সঙ্গে মিললাম মিশলাম। কত দেখলাম কত শুনলাম কত জানলাম কত বুঝলাম। একটা সোজা প্রশ্নের জবাব পেলাম না, সত্যি কি আমি খুনী? কিম্বা আমাকে খুনে বানানো হয়েছে—আমার কোন দোষ নেই? ও অবস্থায় সুধা আর গোলককে খুন না করে আমার উপায় ছিল না? আগে বরং তেজের সঙ্গে ভাবতে পারতাম, বেশ করেছি, এমন বজ্জাত যে মেয়ে আর যার সঙ্গে তার এমন বজ্জাতি, দু'জনকে খুন করাই ছিল আমার মহান কর্তব্য। একটু খামখেয়ালী ছিলাম, পড়াশোনায় যত পারা যায় ফাঁকি দিতাম—ওই মেয়েটার জন্য নিজেকে কলেজে পড়ার বিশ্রী কাজে জেল খাটার মত উঠে পড়ে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। পাশ

করে চাকরী না পেলে ওকে পাওয়ার আশাও যে নিমাই—সেটা তো টের পেয়েছিলাম।

রত্নাকর একটু থামে। জগদীশ কথা কয় না।

ঃ দিবারাত্রি খেটে পাশ করলাম, পাশ করে যাতে চাকরী বাগাতে পারি সেজন্য মাঝে মাঝে বড় চাকরে একজন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে মান অপমান তুচ্ছ করে তার পা চাটতে লাগলাম, —সেকথা ভাবলে আজও বুক ফেটে যায়। মাঝে মাঝে মাথায় ঝিলিক খেয়ে যেত,—একটা মেয়ের জন্য কুকুর হলাম ?

জগদীশ একদম চুপ হয়ে থাকে। রত্নাকরের দম নেবার অবসরে ঝাল মিষ্টি টক কোনরকম কথা বলে নিজেকে জাহির করে না।

এ তো ছা-পোষা প্রবোধ নয় যে বুঝে শুনে ধমক দিলেই উল্টো সুর গাইবে !

বলতে বলতে মেতে গেছে। আবোল-তাবোল উল্টোপাল্টা যা খুশি বলুক, সব তাকে শুনতে হবে !

সেও নেশার ঝোঁকে কত আবোল-তাবোল বকে।

নেশা না করেও একচুমুক খেয়েই রত্নাকর এমন মেতে গিয়ে বলতে সুরু করলে তাকে বলতে দিতে হবে বৈকি, মন দিয়ে শুনতে হবে বৈকি তার কথা।

অষ্টম অধ্যায়

দিনের হিসাব চব্বিশ ঘণ্টা।

তার মধ্যে সাত আট ঘণ্টাই সে স্রেফ ফাঁকি দেয়, কড়া বিষাক্ত নেশায় মজে থেকে।

সত্যই কি ফাঁকি দেয়?

চিত্রাতে এসে সমাপ্তি হল মদ আর মেয়ে নিয়ে তার বিকারের চরম ধিক্কারময় যৌবনের।

সে বিকার কি উত্তরাধিকার?

সে বিকার কি জন্মগত না নিজের অর্জন করা?

প্রথম শীতের বাতাস বইছে। মাঠ বনের চেহারা বদলের সঙ্গে বাতাসে নতুন একটা জীবন্ময় গন্ধ মিশেছে।

আজকাল মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও জগদীশের মধ্যে মরিয়া ভাব জাগে। একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলার প্রচণ্ড ঝোঁক চাপে। রাত্রে নেশা চড়িয়ে সে মরিয়া হয় রোজ—তাকে অনায়াসে সামলে দেয় তাপ্পি আর জিরাইরা, পায়ে ধরে আরেক চুমুক নেশা গিলিয়ে তার মরিয়া হবার ঝোঁকটাকে ঝিমিয়ে শান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে দেয় সে রাতের মত।

জগদীশকে আজকাল দিবারাত্রি চিন্তা করতে হয়।
তার জীবনটা কেন এমন বিশ্রী হয়েছিল, কেন আবার শুকনো গাছের ডালপালার সরস সতেজ হয়ে উঠে নতুন পাতা গজানোর মত সুশ্রী হয়ে উঠছে জীবনটা ?
কেন সহর আর গ্রামের এত লোক জীবনটা সুশ্রী করার জন্য তার কাছে হত্যা দেয় ?
জীবন তো তবে বিশ্রী হতে পারে না !
অসুখ বিসুখ ডাক্তার কবিরাজ হাসপাতাল নার্সিং হোম রাঁচি সহরে চেঞ্জে আসা তো আসল জীবন নয়।
চিত্রা জীবনকে অমান্য করে তাকে বশ করতে চেয়েছিল।
জীবনকে অমান্য করে সে চেয়েছিল চিত্রাকে বশ করতে।
একটা ছেলে, একটা মেয়ে। পরস্পরকে বশ করার জন্য তারা পাগল।
এ ব্যাপার তুচ্ছ নয় জগৎ সংসারের হিসাবী মানুষদের কাছে।
মেয়ে যদি ছেলেকে না চায় আর ছেলে যদি মেয়েকে না চায় তবে তো ফুরিয়েই গেল জীবনের কারবার !
বাপে মায়ে একরকম পীরিত হয়েছিল, পীরিত হয়েছিল ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমায়। সে পীরিত ভাল লাগে নি, ভাল লেগেছিল লিওনরার তড়িৎ প্রত্যয়ের প্রেম আর আত্মরক্ষার দুর্গ গড়া।
লিওনরার প্রশ্নটা নানাভাবে নানারূপে এলেও প্রশ্নটা ছিল একই ; তুমি কি পারবে আমার বাকী জীবনটার দায় বইতে ? তোমার মত পয়সাওলা এদেশের কোন যোয়ান আমার

দায় ঘাড়ে নিয়ে আমার সাথে পীরিত করতে চাইছে না—তাদের সে ক্ষমতা নেই। তুমি পারবে কি বিলাতী বৌকে সারাজীবন সামলাতে ?

সুদর্শনা আর রত্নাকরের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ রাগারাগি, মান অভিমান লক্ষ্য করতে করতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল জগদীশ।

তার কেবলি মনে হচ্ছিল চিত্রার সঙ্গে এইরকম ছ্যাবলামি করতে গিয়ে সে চিত্রার এবং তার নিজের জীবনটা কিভাবে শেষ করে দিয়েছে, মহাপুরুষ তাকে পুরোধা রেখে ওরাও সেই একই বিরোধ সৃষ্টি করছে নিজেদের মধ্যে।

প্রপাতে ঢলে না পড়ে সুদর্শনা ঢলে পড়বে অকাম্য অসহনীয় জীবনে।

প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত করার মোহে রত্নাকর আত্ম-বিসর্জন দেবে সুদর্শনার আত্মীয়-বন্ধু-বর্জ্জন করা সাংঘাতিক ব্যক্তিগত বিদ্রোহাত্মক জীবনের দায় নেবার বিপদ ঘাড়ে নিয়ে।

এদিকে আরও ছড়িয়ে পড়ছে উপজাতীয়দের বিদ্রোহের আগুন। জগদীশের আশ্রমের আশেপাশের গাঁয়েও এসে গেছে। জিরাই তাপ্পিদের কাছে জগদীশ ব্যাপার শোনে, বিবরণ শোনে।

রত্নাকরের কাছেও শোনে।

আশ্রমে আর যেন মন টিকছে না রত্নাকরের, সারাদিন চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

সুদর্শনা এসে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যায়।

বার বার ফিরে যায়, তবু আবার আসে!

সারাদিন টো টো করে ঘুরে রত্নাকর সন্ধ্যার সময় আশ্রমে ফেরে শুনে সেদিন তো সে একেবারে সন্ধ্যার সময় এসে হাজির তরুণের সঙ্গে,—তার মারাত্মক স্পিডে গাড়ী চালানোর ঝোঁককে গ্রাহ্য না করে!

আজ ঠিক যেন তর্কযুদ্ধ হয় না তাদের মধ্যে, ঘরোয়া ধরণের একটা বচসাই যেন হয়ে যায়! এবং দুজনেই যেন রেগে আগুন হয়ে একটু পাশ ফিরে ঘুরে বসে জগদীশের দিকে চেয়ে গুম খেয়ে বসে থাকে।

তরুণ কোথায় কোন আদিবাসীর কুঁড়েতে কাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার আগামী কবিতার মালমসলা সংগ্রহ করছে কে জানে, জগদীশের সঙ্গে খাতির জমাবার কোন চেষ্টাই সে করে না। ঝোঁকের মাথায় একদিন কবিতার বইটা উপহার দিয়ে প্রণাম করেছিল। তারপর একবার জিজ্ঞাসাও করে নি কবিতাগুলি কেমন লেগেছে!

জগদীশ বলে, রতন, তুমি বাইরে গিয়ে বোসো, সোনার সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।

রত্নাকর নীরবে বেরিয়ে যায়। সুদর্শনা নড়েচড়ে মাথা হেঁট করে বসে থাকে।

জগদীশ বলে, সোনা, জান তো আমায় এখানে কোন গোপনতা নেই? রতনকে বললাম বটে তোমার সঙ্গে গোপন কথা আছে

কিন্তু ওটা শুধু কথা বলার কায়দা। রতন বুঝে গেছে তোমার সঙ্গে আমি কি বিষয়ে কথা বলব।

সুদর্শনা নিশ্বাস ফেলে বলে, গোপন তো আমিও কিছু করিনি। এমন আবোল-তাবোল আসি, এরকম ঝগড়া করি, আমি কি জানিনে আপনি সব জানতে বুঝতে পারছেন!

ঃ না গো মেয়ে, আমায় সবজান্তা ভেবো না। ললিতার ব্যাপারটা জানো?

ঃ শুনেছি।

ঃ ললিতা ভেবেছিল, নেশার ঝোঁকে বুঝি মাথা বিগড়ে গেছে, তাই বলেছিলাম ওকে আমি পরীক্ষা করব। নেশা বৈকি, নিশ্চয় নেশা। এমনিতে আমার কোন গোপনতা নেই – কিন্তু নেশা করে সেটা চরমে না উঠলে আমিই কি অতখানি সরল হতে পারতাম? এমনিতেই আমার লজ্জা ঘেন্না ভয় টয় সব মিলিয়ে গেছে। আমি পাগলের মত এমন অনেক কিছু করতে পারি তোমরা যাতে লজ্জা পাবে বিব্রত হবে বিপাকে পড়বে, আমার এতটুকু অস্বস্তি বোধ হবে না। কিন্তু কোনদিন আমি তা করি নি কেন, কোনদিন করব না কেন জান? আমার সব লজ্জা ঘৃণা কাম-টাম পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে, তোমাদের বিব্রত করার অধিকার তো আমার জন্মায় নি! তোমরা এসেছ একটু স্বস্তি চাইতে, আমি সত্যি তো পাগল নই যে কোমরে একটুকরো কিছু জড়াবার আলসেমিতে তোমাদের অস্বস্তি ভোগ করাব!

সুদর্শনা মুখ তোলে।

ঃ ললিতার কাছে শুনে কিছুই বুঝিনি। ওভাবে কেন এসেছিল, ওর রোগটা কি, কেন আপনি ওকে পরীক্ষা করতে চাইলেন— সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে আবোল-তাবোল কথা বলে। ব্যাপারটা কি সোজাসুজি বলবে না কিছুতেই। আলোকবাবু যেদিন এলেন সেইদিন ডিনারে বসে তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে কি কাণ্ডটাই যে করল ললিতাদি। ঠিক যেন পাগল হয়ে গেছে। তারপর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল না কি করল কে জানে, আমরা কত ডাকাডাকি করলাম— সাড়াও দিল না, শব্দও করল না। আলোকবাবু বাইরের ঘরে রাত কাটালেন।

জগদীশের মুখে মুচকি হাসি দেখে তার বর্ণিতা ললিতার মতই যেন পাগল হয়ে গিয়ে চীৎকার করে সুদর্শনা বলে, হাসছেন? অনেকে বলছে আপনিই মাথা বিগড়ে দিয়েছেন ললিতাদির— কোন একটা মতলব নিয়ে কোন একটা প্রক্রিয়া খাটিয়ে কিছু করেছেন।

জগদীশ কিছুমাত্র বিচলিত হয় না।

ঃ সে তো বলবেই পাঁচজন। নিন্দা ছাড়া প্রশংসা হয়? ঘৃণা ছাড়া প্রেম হয়? বেদনা ছাড়া, ব্যাধি ছাড়া আনন্দ হয় স্বাস্থ্য হয়? একটা আছে বলেই আরেকটা আছে। পরীক্ষা করতে চাইলাম বলেই ললিতা ভড়কে গেল, নইলে আমি বলে দিতে পারতাম কি ভাবে রেহাই পাবে। দেহের রোগ, দেহে

প্রাকৃতিক একটা গোলমাল, ডাক্তারকে দেহটা পরীক্ষা করতে না দিলে কি করে ডাক্তার সে রোগ সারাবে ?

সুদর্শনা যেন কোন কি মহা সত্যের সন্ধান পেয়ে আত্মসমাহিতা হয়ে গেছে এমনিভাবে বলে, দেহের রোগ ? ললিতাদির দেহের রোগ ? ওর দেহে তো কোন রোগ নেই. খুঁত নেই। ও নিজে বলে খুঁত আছে, ডাক্তার কোন খুঁত খুজে পায়নি। আলোকবাবু তো ঠিক করেছেন ছ'চার হাজার খরচ করে স্পেসালিষ্ট দিয়ে ললিতাদির মানসিক রোগের চিকিৎসা করাবেন।

জগদীশ কোন ইঙ্গিত করেনি, নিজে থেকে তাপ্পি ঘরে এসে তাকে বিলাতী বোতল থেকে আন্দাজ করে খানিকটা মদ কাঁচের গেলাসে ঢেলে তাতে খানিকটা জল মিশিয়ে জগদীশের হাতে তুলে দিয়ে সরে যায়।

জগদীশ টের পায়, তাপ্পির ভয় হয়েছে !

বিলাতী মাল না টেনে জগদীশ হয় তো সামলাতে পারবে না সুদর্শনাকে।

গেলাসটা নামিয়ে রেখে জগদীশ বলে, মানসিক চিকিৎসা ? স্পেসালিষ্ট দিয়ে ? শরীরের অসুখ মনের চিকিৎসায় সারানো ? তাই তো বলছিলাম, তুমিও যেন ললিতার দশা দেখে উল্টো পথে চলার জিদ করো না।

ঃ আমার দাদা ডাক্তার। তিনিও ছিলেন ডিনারে। বাড়ী ফিরে বললেন, ললিতাদির হিষ্টিরিয়াও জন্মায় নি, ললিতাদি

পাগলও হয়ে যায় নি। আলোকবাবুর সঙ্গে একটা কিছু সাংঘাতিক গণ্ডগোল হয়েছে। এতদিন পরে আলোকবাবু এলেন, সাত আটশ টাকার উপহার নিয়ে এলেন, হিষ্টিরিয়ার রোগীও অন্ততঃ কয়েকদিন সুস্থ শান্ত হয়ে থাকত। দাদা বললেন, ললিতাদির মনে নিশ্চয় ছেলেবেলা থেকে কোন কমপ্লেক্স ছিল—

ঃ তোমায় ডাক্তার দাদা যাই বলে থাক, তোমার ললিতাদির মন ঠিক আছে। দেহ নিয়ে এত করেও মনটা ঠিক রেখেছে, এমন মা কি সহজে মেলে? তোমার ডাক্তার দাদার মাথায় গোবর, মিষ্টার আলোকবাবুর মাথায় গোবর, ললিতার মাথাতেও গোবর—তাইতো এমন ভূতুড়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। ভূতে পেয়েছে হলুদপোড়া দিয়ে সারাও!

সুদর্শনা চুপ করে থাকে। ললিতার কি হয়েছে না হয়েছে সে জানে না, স্পেশালিষ্ট ডাক্তাররাও বোধ হয় জানে না।

নইলে ললিতা সারাদিন সকলের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে অনেকটা মিলেমিশে, মিলিয়ে মিলিয়ে প্রতাপের টাকাপয়সার হিসাব-নিকাশ দেখেশুনে বেশ কাটিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা হলেই তার মাথা যায় বিগড়ে। যেমন তেমন যে কোন রকম একটা ছুতো ধরে আলোকের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ঘুমোয় না।

অনেক রাত অবধি সে যে ঘুমায় না সেটা টের পায় সকলেই।

জেগে থাকে কিন্তু ডাকলে সাড়া দেয় না।

সুদর্শনা আনমনা হয়ে গিয়েছিল। নিজের ব্যাপার ভুলে গিয়ে মশগুল হয়ে গিয়েছিল ললিতার রহস্যময় সমস্যার চিন্তায়।

তাপ্পি আবার মহুয়া মেশানো মদ আনে।

জগদীশ পান করে না, সামনে রাখে।

ঃ আমার দোষ নেই কিন্তু। আমি তোমার সমস্যাটা নিয়েই সুরু করেছিলাম। তুমিই তোমার ললিতাদির সমস্যা নিয়ে বিভোর হয়ে ওইদিকেই চলতে লাগলে, নিজেকে ভুলে গেলে। অন্যের কথা ভেবে নিজেকে ভুলতে পারো বলেই তোমাকে কিন্তু আমি এত ভালবাসি মেয়ে!

সুদর্শনা কাতরভাবে বলে, কিন্তু আমার এরকম হল কেন? সবাই বলাবলি করছে, আমার মাথা বিগড়ে গেছে। একটা আধ-পাগলা ভবঘুরে ভিখারী—

জগদীশ বলে, তোমাদেরই এরকম হয়। বড় বড় কথা ভাববে, বড় বড় আদর্শ আঁচবে, কাজে কিছু করবে না। কিভাবে বাঁচা উচিত জানবে একরকম, জীবনটা করবে অন্য রকম। সব তালগোল পাকিয়ে যাবে না?

নবম অধ্যায়

জলধি রায়েরও পদার্পণ ঘটে জগদীশের আশ্রমে।

প্রবোধকে খুঁজে পেতে সঙ্গে নিয়ে আসে। বলে, একটা গুজব শুনলাম। আরও শুনলাম, আপনার বন্ধু প্রবোধবাবুই নাকি গুজবটা ছড়াচ্ছেন। ওনাকে সঙ্গে নিয়েই দেখতে এলাম ব্যাপারটা কি।

সকলকে তুমি বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। এই সেদিনও জলধিকে মিষ্টার রায় বলে সম্বোধন করেছে, আপনি বলে কথা বলেছে, সে সব যেন খেয়ালও নেই জগদীশের। চুলপাকা ভুরু পাকা অজানা অচেনা প্রতাপ এসেই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিল, শিশুর মত কাতরভাবে ভক্তি গদগদকণ্ঠে বাবা বলে ডেকেছিল, তাকে তুমি না বলে উপায় থাকেনি।

জগদীশের এটাও খেয়াল থাকে না যে জলধি ভক্ত বা শিষ্য হিসাবে তার কাছে আসে নি।

সাধুবাবার কাছে সে আসে নি। এসেছে জগদীশের কাছে। আগের পরিচয়ের জের টানতে এসেছে।

কেন এসেছে সেটা অবশ্য হঠাৎ বোঝা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু

বোঝা যায় যে তার শুধু নিছক কৌতূহল নয়। কিন্তু প্রবোধকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

শুধু অভ্যাসের বশে যান্ত্রিকভাবে নয়, হাসিমুখে আন্তরিকতার সঙ্গেই বলে, জলধি এসেছ? বোসো। অন্য কেউ হলে নিয়ম ভাঙ্গার জন্য দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতাম। সন্ধ্যার পর আমি কারো সঙ্গে দেখা করি না। প্রবোধকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এসেছ, তোমাদের বেলা আইন ভাঙ্গতেই হবে।

প্রবোধ বোস।

জলধি বসেও না, কথাও বলে না। তার মুখের ভাব দেখে জগদীশ আমোদ পায়। জলধি চটেছে। ভীষণ চটেছে। তাকে জগদীশ বাপের মত, মহাপুরুষ সাধুর মত, এরকম সহজ অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা জানাবে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

তাকে খানিকটা ধাতস্থ করার জন্য জগদীশ খানিকটা হাল্কা ইয়ারকির সুরে বলে, আরে বাবা বোসই না! অ্যাদ্দিন পরে দেখা হল, ভদ্রতা করা দিয়ে সুরু করলে আজ শুধু ভদ্রতাই করা হবে। বোস, বন্ধুর মত আলাপ শুরু করে দাও। মিষ্টার-ফিষ্টার, আপনি-টাপনির ভজঘট জুড়ো না। ইচ্ছা হলে তুই-তোকারি চালিয়ে যাও।

প্রবোধের শঙ্কিত ভাব দেখে জগদীশ মনে মনে আরও আমোদ পায়।

জলধি ধীরে ধীরে বসে। চারিদিকে চোখ বুলায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জগদীশকে ছাখে।

তারপর খানিকটা সহজ সুরে বলে, শেষকালে এইখানে এসে সাধু সেজেছেন ? ব্যাপারটা কি ?

জগদীশ বলে, সেই চিরকেলে ব্যাপার। মানুষকে ছাড়লাম, সভ্যতা ভুললাম—কমলি কিন্তু আমায় ছাড়ছে না! এখানে ধাওয়া করে এসে পাকড়াও করেছে।

জলধি আশ্চর্য্য হয়ে বলে, এই সোজা কথাটা জানতেন না? অসভ্য জংলীদের বাদ দিয়ে কি মানুষের সভ্যতা ? ওরা দলে দলে না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে বলেই তো সভ্যতা আকাশে উড়তে শিখেছে।

ঃ মানুষকে আকাশে ওড়াতে সভ্য মানুষও প্রাণ দিয়েছে—অনেকে দিয়েছে। সভ্যতা অসভ্যতার বিচারটা আমরা গ্রাম আর সহরের মাপকাঠিতে করি কি না—তাই ভুল হয়ে যায়। সহরের গুণ্ডা কি গেঁয়ো বুনো মানুষের চেয়ে সভ্য ? যুদ্ধ বাধিয়ে চারিদিকে সর্ব্বনাশ ছড়িয়ে সভ্যতাকে দুর্ব্বল করে যারা কুবেরের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়—তারা কি সভ্য ?

এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার রত্নাকর সামনে এসে বসে। জিজ্ঞাসা করে, খবর কি জলধিবাবু? কেমন আছেন ?

ঃ জীবনবাবু, আপনি এখানে ? আমার তো আশ্চর্য্য লাগছে !

ঃ কেন ? আপনি এসে জুটলেন সেটা আশ্চর্য্য নয়—আমি এলে সেটা খাপছাড়া হবে কেন ?

ঃ এঁর সঙ্গে আগে আমাদের জানা চেনা ছিল। আপনি কি

আগে এঁকে চিনতেন? আপনাকে তো ওই সার্কেলে কখনো মিশতে দেখিনি!

রত্নাকর বলে, জানা চেনাটা নতুন করে হয় না? যাদের মধ্যে জানা চেনা হয়েছে তাদের মধ্যেই সেটা চিরকাল সীমাবদ্ধ থাকে নাকি? উনি কি আপনাদের আগেকার সেই উঁচু সার্কেলে রয়ে গেছেন—ওঁকে আজ আবার নতুন করে আমাদের সার্কেলটা জানতে চিনতে হচ্ছে না?

জগদীশ হেসে বলে, অন্যায় অনুযোগ করছ রত্নাকর। পাঁচ বছরের ছেলেকে ছেড়ে বাপ যদি বিদেশে যায় বিশ বছরের জন্য—বাড়ী ফিরে সে কি চিনতে পারবে ছেলেকে? একটা একদম অজানা নওজোয়ানের সঙ্গে নতুন করে জানা চেনা করতে হলে সেটা কি দোষের কথা হবে? জলধি এসেছে আমার সঙ্গে আগের পরিচয়ের সূত্র ধরে, তোমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেছে—কিন্তু আমাকেও চিনতে পারছে না তোমাকেও চিনতে পারছে না। অনুদার হয়ো না রত্নাকর, ওকে একটু সমঝে নেবার সময় দাও।

প্রবোধ হাঁ করে চেয়ে থাকে। তার সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে।

বোঝা যায় অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে সে ভাবছে, এই কি সেই জগদীশ? সেই অস্থির চঞ্চল ভাবোন্মাদ খাম-খেয়ালী একগুঁয়ে উচ্ছৃঙ্খল জগদীশ?

এ জগদীশ যে কথা কইছে দিব্যদর্শী ঋষির মত।

ঃ এমন রোগা হয়ে গেছিস ?

জগদীশের সহজ সাদামাটা ঘরোয়া প্রশ্ন শুনে চমকে উঠে প্রবোধ বড় লজ্জা পায়। লজ্জাটা সামলে নিতে তার খানিকটা সময় লাগে।

ঃ বড় ঝনঝাট সংসারে, না ?

জগদীশ হাসিমুখে পুরানো দিনের বন্ধুর মত অন্তরঙ্গভাবে এ প্রশ্ন করতে প্রবোধ রেগে যায়।

ঃ সাধু হয়ে কী এমন মোটাসোটা হয়েছিস তুই ? সংসারে ঝনঝাট আছে, তোর সাধুগিরিতে বুঝি ঝনঝাট নেই ?

ঃ চটিস কেন ভাই ? আমি কি তোর সত্যিকারের সেরকম সাধু ? সাধু হবার কোন সাধ নিয়ে এখানে ডেরা বেঁধেছিলাম ? দশজনে গায়ের জোরে আমায় সাধু বানিয়েছে—কত বকি-ঝকি তবু শুনবে না। ঝনঝাট বৈকি—বিষম ঝনঝাট। এই ছনের কুঁড়েতে মদ খাওয়ার চেয়ে কলকাতা প্যারি লণ্ডনের হোটেলে মদ খাওয়া ঢের সহজ।

কথাবার্তা বলে তর্কবিতর্ক চালিয়ে হারিয়ে যাওয়া পরিচয়কে খানিকটা নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা জলধির কিন্তু একেবারেই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'একটা কথা বলে—তাও আবার হয় খোঁচা দেওয়া ব্যঙ্গ করা কথা !—তার মনের জ্বালার ঝালটা বেশ টের পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে জগদীশকে লক্ষ্য করে, তার কথা শোনে।

হঠাৎ ঝিলিক মারার মতই তার দৃষ্টি শানিত হয়ে ওঠে।

জগদীশ একসময় সহজভাবেই বলে, কত লোকেই তো সাধু সেজে মানুষ ঠকাচ্ছে—আমি ঠকাচ্ছি বলেই এত রাগ কি করতে আছে জলধি? রাগের জ্বালায় তোমার নিজের কষ্টই বাড়ছে!

জলধি রূঢ়ভাবে বলে, আমি কি শিশু যে আপনি সাধু সেজেছেন বলে রাগ করব? কিন্তু আমি আপনার শিষ্যও নই, ভক্তও নই—আমায় দয়া করে তুমি বলবেন না!

জগদীশ হেসে বলে, সবাইকে আমি তুমি বলি, আপনি বলা আসে না। তুমিও আমায় তুমি বল না, চুকে যাক। রত্নাকর গোড়ায় আপনি বলত, তারপর তুমিতে পৌঁছে গেছে। কদিন পরে হয় তো তুই তোকারি স্থুরু করবে।

জলধি বলে, ওসব ন্যাকামি আমার আসে না।

ঃ আসবে—যাতায়াত করতে করতে আপনা থেকেই আসবে।

সেদিন রাতে আবার জলধি আসে।

তারই ইঙ্গিতে চারজন মানুষ এসে নীরবে জগদীশের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ার সামনে দাঁড়ায়, তাদের তিনজনের হাতে রাইফেল, একজনের হাতে রিভলবার।

গায়ে যেন জোর পায় জলধি।

কে জানে জগদীশের মেজাজটা সে রাত্রে আগে থেকেই ভাল ছিল কি না অথবা জলধির কাণ্ড দেখে তার মেজাজ ভাল হয়ে যায়!

ঃ একেবারে ফৌজ নিয়ে হাজির? তুমি বলায় এত রাগ হয়েছে জলধি ?

ঃ আপনার এই কেন্দ্রটা খুলবার পর বড় বেশী চুরিচামারি হচ্ছে চারদিকে। আপনার দোহাই দিয়ে চোরেরা রেহাই পাবার চেষ্টা করছে। আপনার আশ্রমের নামে ভিজিটরদের ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা আদায় করছে। এসবের পিছনে আপনি আছেন, আপনিই সব কিছুর জন্য দায়ী। দুঃখের কথা হল, কিন্তু কি করব, আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

ঃ গ্রেপ্তার কর।

ঃ তা হলে দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন।

আবলুষ কুঁদে তৈরি করা শ' তিনেক মেয়েপুরুষ আঁধার ফুঁড়ে জড় হয় কুটিরের সামনে ।

অস্ত্রধারী চারজনকে তিনদিকে ঘেরাও করে জমাট বাঁধে।

কারো হাতে কোন অস্ত্র নেই। যে সব আদিম অস্ত্র সম্বল করে তারা বাঘ ভালুকের রাজত্বে শিকার করতে যায়, সে অস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত সঙ্গে আনে নি।

জলধি একবার গলা খাঁকারি দেয়।

জগদীশ হেসে বলে, প্ল্যান ঠিক করাই ছিল? কিন্তু এ প্ল্যানে কি সামলাতে পারবে? তিন চারশো লোক মরিয়া হয়ে হঠাৎ ঘিরে ধরলে চারটে রাইফেল কি করতে পারে?

ঃ বাগে পেয়ে চুকলি শোনাচ্ছেন ?

খুব নমিত শান্ত মনে হয় জলধির প্রতিবাদ।

ঃ বাগে পেয়েছি নাকি তোমাকে? আমার তো জানাও ছিল না তুমি হঠাৎ এভাবে আসবে। ওরা আমার কথায় ওঠে বসে। আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তোমায় ছিঁড়ে খাবে না, ভয় নেই। ওরা কেন আমায় এত ভালবাসে জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

ঃ বলুন না শুনি।

ঃ তোমার সাহস আছে। কি করে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে ভাবছ অথচ দেখাচ্ছ যেন আমার কথা শোনার জন্য তোমার আগ্রহের অন্ত নেই। একটা পেগ চলবে? সেরা স্কচ।

জলধি হাতের তালুতে তালুতে ঘরে ঠিক যেন জ্বালা ও আপশোষের ফেনা তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে বলে, না।

আড় চোখে সে চেয়ে ত্যাখে, তার জবাব যেন শুনতেই পায় নি এমনিভাবে জগদীশ দামী বিলাতী বোতলের মদ স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে ঢেলে তার সামনে এগিয়ে দেয়।

বলে, বোসো না আরাম করে। আতিথ্য গ্রহণ না করে আমাকে অপমান করতে পার—কিন্তু তোমাকে ওরকম ছেলেমানুষ ভাবতে পারছি না।

এক গেলাস জলও জগদীশ গড়িয়ে দেয়।

জলধি হাসবার চেষ্টা করে বলে, জল ভাল তো? কলেরা হবে না তো?

ঃ ঝরণার জল। প্রপাত থেকে আনা।

ঃ যাকগে। আপনি তো আর সাধারণ মানুষ নন, ছোট

লোকের মত প্রতিহিংসা আপনি নেবেন না। কিন্তু এইটুকু খেয়ে কি পোষাবে?

একান্ত অবহেলার সঙ্গে দামী বিলাতী মদের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে জগদীশ বলে, ভয় পেয়ো না। কুঁড়ে ঘরে থাকলেও আমি আতিথ্য জানি। উনিশ বিশ বয়স বয়েস থেকে জানি এক চুমুকের মদ কাউকে অফার করা অসভ্যতা, খেতে না পেয়ে যে মরে যাচ্ছে তাকে দু'চামচ দুধ খেতে দেওয়ার মত ছোটলোকামি।

বোতল কাত করে আরও খানিকটা মদ গেলাসে ঢেলে অল্প একটু জল মিশিয়ে কি রকম তৃষার্তের মত জলধি গেলাসের সেটা শুষে নেয় দেখে জগদীশ মমতা বোধ করে।

প্ল্যান ফসকে বিপাকে পড়ার রাগে ভয়ে অপমানে তার গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে বুঝতে কষ্ট হয় না।

সিপাই নিয়ে জলধির আকস্মিক আবির্ভাব আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে ললিতা ও সুদর্শনার আবির্ভাবে।

ক্রোধে সুদর্শনার মুখে গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনা ফুটেছে। রাগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল।

ঃ আমাদের গালে চুণকালিও দিলেন, আমাদের বিপদেও ফেললেন। আপনি কেমন মানুষ জলধিবাবু?

জলধি তখন আকাশ ছাড়িয়েও অনেক উঁচুতে চড়েছে। নিয়মিত নয়, অভ্যস্ত তার নয়, তাই বেশী মাত্রা দরকার হয় না।

প্রথমে হাতজোড় করে। তারপর হাসে। তারপর বিকৃত মুখভঙ্গির সঙ্গে সুদর্শনাকে স্যালুট করে। তারপর আবার হাসে।

ঃ কেন? কি করেছি? পুরানো বন্ধু, মহাপুরুষ—একবার দেখা করতে এলাম।

সুদর্শনা গর্জন করে ওঠে, পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসতে আপনার চারজন আর্মড্ গার্ড লাগে? বাবাকে কি বলে ভুলিয়েছেন আমি জানি না ভেবেছেন? বাবাও অস্বস্তি বোধ করছিলেন—হুকুম নিয়ে এসেছেন, উপায় নেই, নইলে বাবা গাড়ীও দিতেন না, গার্ডও দিতেন না। বাবার রকম দেখেই আমার সন্দেহ হল—আপনিও বাড়ী নেই। জিজ্ঞাসা করতে বাবা যা বললেন শুনেই বুঝতে পারলাম একটা মতলব নিয়েই এসেছেন। ছি ছি!

জগদীশ হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, বাবা কি বললেন? বাবার মুখে কি শুনে ব্যাপার অনুমান করে তুমি আমার নতুন মাকে সাথে নিয়ে আমায় বাঁচাতে ছুটে এলে?

ললিতা ও সুদর্শনা একবার চোখে চোখে তাকিয়ে নেয়।

জগদীশের জিজ্ঞাসায় জবাব দেয় সুদর্শণার বদলে ললিতা।

ঃ বুনোরা হাঙ্গামা করছে জানেন তো? জলধিবাবু ব্যাপারটা বুঝতে এসেছেন। কিছুই করবেন না, শুধু আনঅফিসিয়ালি ব্যাপারটা দেখে শুনে বুঝে গিয়ে একটা রিপোর্ট দেবেন। উনি যাতে বিপদে না পড়েন সেজন্য অর্ডার আছে যে উনি

চাইলেই আর্মড গার্ড দিতে হবে। আজ দুপুরে আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল—আজ বাবার জন্মদিন। জলধিবাবু প্রথম থেকেই—ললিতা একটু থামে।

জলধির ঢুলু ঢুলু ভাব দেখে মনে হয় না সে কোন কথা শুনছে বা বুঝছে।

তার দিকে চেয়ে সঙ্কোচ জয় করে ললিতা বলে যায়, প্রথম থেকেই খালি চিত্রাদির কথা বলতে লাগলেন। কি সব বিশ্রী কথা, চিত্রাদিকে নাকি খুন করা হয়েছে—

জলধি জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, নিশ্চয় খুন করা হয়েছে! এই গুণ্ডাটা খুন করেছে।

ভোর রাতে জগদীশের ঘুম ভেঙ্গে যায়!

দিনে প্রবোধ আর জলধি এসেছিল বলে নয়। রাতের নাটকীয় কাণ্ডটার জন্যও নয়। প্রাণে নতুন একটা জিজ্ঞাসা জেগেছিল বলে সে নেশাকে খাতির করে নি।

নেশা আর অভ্যাসের পার্থক্য কতখানি সেটা তো আর তার অজানা নেই।

পেটের গোলমালের জন্য সুদর্শনার মা ছাড়াও তার কয়েকজন ভক্ত নিয়মিত আফিং খায়—কেউ খায় তিল পরিমাণে, কেউ খায় বেশী।

কেউ ওষুধের মত নিয়মিত আফিং খেলেই তার দুধ খাওয়ার অধিকারটা সংসারে স্বীকৃত হয়।

শিশুদের দুধে সে ভাগ বসালেও তার অপরাধ হয় না। তাই একই ওষুধ খেলেও ওদের মধ্যে কারো বেলা সেটা হয় অভ্যাস, কারো বেলা হয় নেশা।

শেষরাত্রের আবছাওয়া আলো-অন্ধকারে প্রপাতের দিকে চলতে আরম্ভ করেই জগদীশ টের পায় যে ভক্তদের পাহারায় ঢিল পড়েছে।

কয়েকমাস ধরে দিনেরাত্রে যে কোন সময়ে প্রপাতের দিকে যাওয়া বন্ধ করেছিল বলে ওদের সতর্ক দৃষ্টিতে একটু শিথিলতা এসে গেছে।

আমোদ বোধ করছে জেনেও বুকটা টনটনিয়ে ওঠে জগদীশের। কি দিয়ে সে অর্জন করছে সকলের এই ভালবাসা? তাকে পাছে বনের বাঘে-ভালুকে সাবাড় করে সেজন্য এদের এত ভয়, এত সতর্কতা?

দশম অধ্যায়

জগদীশ জিজ্ঞাসা করে, শান্তি কি কিছুটা পাচ্ছ প্রতাপ? অশান্তির ঝাঁঝ কিছু কমেছে?

প্রতাপ কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হয়ে বলে, অনেক কমেছে বাবা। অশান্তির ঝাঁঝে চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। তোমার কৃপায় মতিগতি কত যে বদলে গেছে ছেলেমেয়ে বৌমাদের।

জগদীশ হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, তোমার সোনার ছেলে আলোক আসে না কেন?

কয়েক মিনিট মাথা হেট করে থাকে প্রতাপ।

ঃ ওর হল কাজের মানুষের মতিগতি। কাজের বিষয় ছাড়া কোন কথা জানতে চায় না, বুঝতে চায় না। বলে কি, কাজ করার, কাজের চিন্তা করার সময় পাই না, আমায় ওসবের মধ্যে টেনো না।

একটু থেমে মুখ তুলে খুশির সঙ্গে বলে, এবার দেখছি ভাব-সাব খানিকটা অন্যরকম। সব তোমার দয়া বাবা—সাধে কি আমি তোমার চরণ সার করেছিলাম শেষবারের মত। তুমি যদি না দয়া করতে বাবা, আমি ধর্মকর্ম্ম সংসার ছেড়ে দিয়ে বুড়ো

বয়সে বেশ্যাবাড়ীতে গিয়ে ঠাঁই নিতাম—মদ বেশ্যা সার করে নরকে যেতাম।

পরম ভক্ত প্রতাপ তার কথা বলার ধাঁচ আয়ত্ত করেছে, মনের চিন্তা হৃদয়ের ভাব মিলিয়ে মিশিয়ে কথা বলার ষ্টাইল বেশ খানিকটা অনুকরণ করতে শিখেছে।

জগদীশ বলে, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে ছলনা করেছিলে প্রতাপ। তোমার সোনার ছেলে আলোক আর ললিতার মধ্যে যে মিল নেই এটা গোপন করেছিলে।

হাত বাড়িয়ে জগদীশের পা ছুঁয়ে প্রতাপ বলে, বিশ্বাস কর বাবা, ছলনা করি নি। আমি কিছুই বুঝি না ওদের ব্যাপার। কি বলতে কি বলে ফেলব, উল্টো কথা মিছে কথা বলে বসব—এই ভয়ে চুপ করে থেকেছি। চিরকাল সংসারে দেখলাম মিল না থাকলে স্বামী-স্ত্রীতে নানারকম ঝগড়া হয়, অশান্তির সীমা থাকে না। কোনদিন ওদের মধ্যে মনোমালিন্যের চিহ্নটুকু দেখি না।

ঃ সোজা হয়ে বসো প্রতাপ। বারবার পায়ে হাত দিও না। অতিভক্তি যে চোরের লক্ষণ তা তো জানো?

প্রতাপ আহত হয়ে সোজা হয়ে বসে। জগদীশ বলে, চোখ থাকতে অন্ধ, কি করে দেখতে পাবে সোনার ছেলে আর সোনার বৌমার মধ্যে মনোমালিন্যের চিহ্ন? তোমার সেবা করার জন্য ললিতা স্বামীর কাছে না থেকে তোমার কাছে থাকে, তোমার বিষয়কর্ম ব্যবসায়ের খুঁত ধরে লাভ বাড়ায়, কি করে তোমার চোখে পড়বে ওদের মনোমালিন্য?

ঃ ওদের মাঝে মাঝে দেখা তো হয়? রাগ অভিমান কখনো দেখি নি। হাসিমুখে মিষ্টি সুরে কথা কয়—
জগদীশ প্রায় গর্জন করে ওঠে, প্রতাপ! মনে আছে প্রথম দিন তোমায় বলেছিলাম, তোমার প্রণামী আমি নেব না, তোমার শান্তি জুটবে না? মনে আছে, প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিলাম? এই বুঝি তোমার প্রায়শ্চিত্ত করার নমুনা!
প্রতাপ কাতরভাবে বলে, যা বলছেন তাই তো শুনছি—
ঃ কই শুনছ? স্পষ্ট বলে দিলাম—লাভের টাকাকে ভগবান না করে মানুষকে এবার ভগবান কর। বড় স্কেলে না পার, নিজের মস্ত সংসারটার মানুষগুলোকে অন্ততঃ বড় ভাবো তোমার বিষয় সম্পত্তি টাকা পয়সার চেয়ে। শুনে তুমি ভড়কে গিয়েছিলে। ভেবেছিলে, আমি তোমার মধ্যে বৈরাগ্য জন্মিয়ে তোমায় সন্ন্যাসী করে দিতে চাই। মনে আছে বলেছিলাম, লাভের টাকার মায়া কাটিয়ে দিতে চাইলে তুমি ভড়কে যাবে?
প্রতাপ নীরবে চেয়ে থাকে।
ঃ মনোমালিন্য চোখে পড়ে নি আদুরে ছেলে, আদুরে বৌমার? তোমার সোনার ছেলে ছুটি নিয়ে বাপের বাড়ী এলে তোমার সোনার বৌমাটি যে নানা ছুতায় দু'একদিনের মধ্যে বাপের বাড়ী পালায়—এটা তুমি খেয়াল করনি বলতে চাও?
প্রতাপ যেন খুশিতে ফেটে পড়ে! বলে, মহাপাপী আমি, তাইতো কদিন ধরে ভাবছিলাম শেষ জীবনে মরার আগে

শেষ বারের মত যার চরণ সার করলাম, তিনিও কি শেষ পর্য্যন্ত আমায় ঠকাবেন ? দিব্য দৃষ্টি আছে জেনে যাঁর কাছে এলাম, তাঁকেও জানাতে হবে সব খুঁটিনাটি বিবরণ, তবে তিনি আমার অশান্তি দূর করবেন !

মাথা হেঁট করে প্রতাপ দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিটা দিয়ে গোবর-লেপা মেঝেতে খানিকক্ষণ আঁচড় কাটে ! তারপর ধীরে ধীরে হলেও জোরের সঙ্গে বলে, সব দেখেছি বাবা। এতো কোন সূক্ষ্ম-দর্শন নয় যে বোকা-হাবা আমি মোটা চোখে দেখতে পাব না। আলোক ছুটি নিয়ে বাড়ী এলেই দু'চার দিনের মধ্যে বৌমা ছুতো করে বাপের বাড়ী চলে যায়। একবার ছুতো হল তার বাপের অসুখ একবার তার দিদিমার শ্রাদ্ধ—

জগদীশ শান্তভাবে বলে, এই তো প্রায় বুঝে গিয়েছ ব্যাপারটা প্রতাপ। আরেকটু বুঝতে তোমার সাহস হয় না কেন ? ভয় পাও কেন ?

কিন্তু সব বাপ তো এরকম করে না। যাব যাব বলে—কিন্তু নিজেই শেষ পর্য্যন্ত আর যায় না। বেশ হাসিখুশি ভাবেই থাকে। তাইতো ঠিক বুঝি না বাপ।

ঃ তোমার ছেলের তো বোঝা উচিত ?

প্রতাপ চুপ করে থাকে।

ঃ মানুষ পাগলের মত টাকা চায় কেন প্রতাপ ? বালিশের নীচে কোটি টাকার নোট রেখে, টাকা চিবিয়ে খেয়ে কি কোন সুখ হয় মানুষের ? টাকা দিয়ে সুখ কিনতে

হয় বলে বাঁকা মানুষের ধারণা জন্মে গেছে, টাকাই বুঝি সুখ। দেখতে পাও না, কাটা ছাগলের মত ছটফট করছে লাখ লাখ টাকার মালিক? এমন নেশা টাকা রোজগারের যে তোমার সোনার ছেলে জানে না কিছু টাকা খরচ করে চিকিৎসা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, বৌটাকে আর স্বামীর ভয়ে বাপের বাড়ী পালাতে হবে না। তোমার সেবার ছুতো ছেড়ে, তোমার ছেলের সঙ্গে গিয়ে তোমাকে দু'চারটে নাতি-নাতনি উপহার দিয়ে—

প্রতাপ গুম খেয়ে বসে থাকে ঘণ্টাখানেকেরও বেশী।

জগদীশ বলে, আলোককে পাঠিয়ে দিও—ওর সঙ্গে কথা বলব।

কত মানুষ আসে যায়। কত কথা, কত আলোচনা হয়।

জগদীশকে কোন কোনদিন খুব বেশী রকম খুশি মনে হয়।

তাকে নিয়ে এমনভাবে পাগল হয়ে গেল মানুষেরা? কোনদিন আবার তার মুখ গম্ভীর হয়ে থাকে।

বুনো মানুষ, গরীব চাষী মানুষ, অশিক্ষিত দোকানী কারবারী মানুষ, অল্পশিক্ষিত ধনী ব্যবসায়ী মানুষ, শিক্ষায় দীক্ষায় টাকায় পয়সায় বনেদী মানুষ, আপিসের কেরানী মানুষ, কারখানার মজুর মানুষ?

ভেবে মাঝে মাঝে অহংকারে আকাশে উঠে যায় জগদীশের মন। মাঝে মাঝে আতঙ্কের নরকে নেমে গিয়ে আত্মগ্লানির আগুনে দগ্ধ হয়।

কী সে করেছে মানুষেব জন্য ?

কিছুই করেনি।

অনেক মেয়ের সঙ্গে খেলা করে একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল— নিজের দোষে তাকে হারিয়ে প্রাণের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে, নেশা করার বিষের আগুনে পুড়তে পুড়তে মরতে চাওয়ার কী অদ্ভুত পরিণাম এটা যে বিচিত্র বিচিত্র মহামানবতা তার কুঁড়ে ঘরের দরজায় এসে হানা দিয়ে দাবী জানায়—শান্তি দাও, জীবন দাও, বাঁচাও!

ঃ রত্নাকর, আমি কী করে মহাপুরুষ হলাম বলতে পার ?

ঃ ভালবাসাকে তুলে ধরতে জীবন যৌবন ধন মান বিসর্জন দিয়েছ বলে। আখেরে লাভের আশায় ওসব ত্যাগ করনি বলে। তুমি খাঁটি ত্যাগী বলে, আদর্শের জন্য ত্যাগ করেছ বলে। একজনকে যে এমনভাবে ভালবাসতে পারে, মানুষকেও যে কি রকম ভালবাসতে পারে তুমি জানো না, তোমার বড় বেশী বিনয়।

ঃ ভালবাসার মানে জান ? বুঝিয়ে দিতে পার ?

ঃ বুঝিয়ে দিতে পারব না। ভালবাসা নিয়ে তুমি যে কাণ্ড জুড়েছ দাদা, আমরা বেশ কিছুটা ভড়কে গিয়েছি।

ঃ আমি তো মহাপুরুষ হবার কোন চেষ্টা করিনি।

ঃ করনি বলেই মহাপুরুষ হয়েছ। জানাইতো আছে যে মহাপুরুষ হবার চেষ্টা করলে সব ভেস্তে যাবে। তাই মহাপুরুষ না হবার চেষ্টায় মহাপুরুষ হয়েছ।

: তোর বাঁকা কথা আমি বুঝি না।
: চেষ্টা না করেই বুঝবে, এমন কথা বলি নাকি? বুঝবার চেষ্টাই কর না তো কি হবে! শিষ্যের কথা গুরু বুঝবে না সেটা তো গুরুর সব চেয়ে বড় অপরাধ। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক থাকবে—শিষ্যের কথা গুরু বুঝবে না! গুরুরতো সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। শিষ্য গুরু হয়ে গেল।
: তোকে আবার শিষ্য করলাম কবে?
তাপ্পি এসে খবর দিয়ে যায় আজ মহুয়া জুটবে না জগদীশের। বিলাতীর সঙ্গে মহুয়া চালিয়ে বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছে জগদীশ—তার শরীর ভেঙ্গে পড়ছে।
যত বড় সাধু হোক, যত বড় যোগী হোক—বুনো মানুষ তারা ঠিক করেছে আজ থেকে তাকে মহুয়া দেওয়া বন্ধ।

পরদিন প্রতাপ এসে অপরাধীর মত বলে, আলোক বলল, নানা কাজে খুব ব্যস্ত—কদিন পরে সময় করে আসবে।
: ছুটি নিয়ে এসেছে না? তবু ব্যস্ত?
প্রতাপ প্রায় কাতরভাবে বলে, ওর মন ও মেজাজটা একটু অন্যরকম বাবা।
জগদীশ হেসে বলে, বেশ তো। গরজ আমার, আমিই কাল গিয়ে তোমার ছেলের সঙ্গে দেখা করব। যত ব্যস্তই হোক, দুপুরে বাড়ীতে স্নানাহার করে তো? বারোটা একটার সময় বাড়ীতে থাকে তো? আমি সেই সময়ে যাব।

প্রতাপ মাথা হেঁট করে থাকে।

পরদিন সকালেই আলোক আসে—হ্যাটকোট পরা আলোক। রকম দেখেই টের পাওয়া যায় মরিয়া বাপের খাতিরে অগত্যা বাধ্য হয়ে এসেছে—ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে এসেছে।

জুতো পায়েই কুঁড়েতে ঢোকে।

জগদীশ বলে, এসো। আমি জানতাম তুমি আসবে। বোস। জগদীশ হুকুম দেয়, সাব'কে চৌকী দে জিরাই।

পরক্ষণে হাজির হয় বাঁশ আর বেতে বোনা হাতখানেক উঁচু মোড়া-জাতীয় টুলটা।

ঃ আর বছর এক ব্যাটা ইংরেজ এসেছিল। লণ্ডনে ছিলাম বছর দেড়েক, তখন আলাপ হয়েছিল। আলাপ হতেই প্রথম কথাটা কি বলেছিল জানো? আমি ভারতকে জানতে চাই, আমি ভারতকে নিয়ে বই লিখতে চাই। ভেবেছিলাম আমায় খাতির করে বলছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম—ভারত সম্পর্কে ব্যাটার কৌতূহলের সত্যি সীমা নেই।

বাঁশ ও বেতের টুলটায় আলোক সন্তর্পণে বসে। আসনটা বেশ শক্ত টের পেয়ে সে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে পাইপ ধরায়।

বলে, আপনি যে বিলাত গিয়েছিলেন আমি তা জানি। কয়েক বছর পরে গিয়েও আমি শুনে এসেছি আপনার সব কাণ্ড-কারখানার কথা।

ঃ সে তো শুনবেই। এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে বিলাত গিয়ে

আমি তো ইংরেজ হবার চেষ্টা করিনি। ভারতের টাকাকে ইংরাজ মেয়েরা কত খাতির করে তাই দেখাতে চেষ্টা করছিলাম।

ঃ ইংরাজ মেয়েরা খুব সস্তা দেখে এসে মনের দুঃখে ভারতীয় যোগী বনেছেন ?

ঃ না ঃ! দু'একটা সস্তা মেয়ে দেখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিশেই টের পেলাম—না, টাকা দিয়ে সুবিধা হবে না। এই জঙ্গলে এসে এত বছর ধরে বুঝবার চেষ্টা করে মেয়েদের সম্পর্কে সার কথাটা কি জেনেছি জানো ?

মেয়েরা কোন দেশে সস্তা নয়, মেয়েরা সব দেশে মা। বেশ্যা মানে কি বুঝেছি জানো ? মা হতে অক্ষম কিছু মা অগত্যা বেশ্যা হয়েছে বাপেদের মুখ চেয়ে—মেয়েমানুষকে তারা মা মনে করে, মায়েদের যারা খেতে পরতে দেয়।

আলোক হাতঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বলে, আমি ভক্তি জানাতেও আসিনি, তর্ক করতেও আসি নি। বাবার তাগিদে এসেছি। কাজের কথাটা মিটিয়ে দিলেই আমি বিদেয় হতে পারি।

ঃ বিদেয় হও ! বাপের টাকা আছে—বাপের খাতিরে অগত্যা বাধ্য হয়ে এসে আমার কথা শুনবে, আমি কি সেজন্য তোমায় ডেকেছি ? বাপের খাতিরে আসতে পারবে অথচ বিরক্তি চাপতে পারবে না—এরকম সস্তা খাতির কর কেন বাপকে ?

আলোকের মুখে হাসি ফোটে।

সে চুপ করে থাকে।

জগদীশ ধীরে ধীরে বলে, আমার চেয়ে তুমি মহাপুরুষ। তোমার পেটে অনেক বেশী বিদ্যা। নিজের স্ত্রীর দেহের খুঁত ধরতে পার না? চিকিৎসা করাতে পার না? ললিতা আমার মেয়ের মত—তবু সত্যিকারের মেয়ে নয়, তাই আজ বেঁচে গেলে। তুমি সত্যিকারের জামাই হলে আজ এই মদের বোতল দিয়ে তোমার মাথা ফাটিয়ে দিতাম।

সিগারে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আলোক বলে, কেন ডেকে পাঠিয়েছেন মোটামুটি অনুমান করেছিলাম। বিরক্ত হয়েছি সেইজন্যই। জানেন না বোঝেন না, সব ব্যাপারে আপনার মাথা গলানো কেন? আবার সিগারে টান দিয়ে বলে, আপনার মেয়ের দেহে খুঁত? অনেক স্পেসালিষ্ট ডাক্তার দেখিয়েও ধরা যায় নি কোথায় কি খুঁত। তার মানেই খুঁতটা ওর মনে। মানসিক চিকিৎসা করাব বলেই তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি। সেদিন রাত্রে একা ললিতা আপনার কাছে এসেছিল, আমি কি জানি না ভেবেছেন? বাড়ীর কারো নজর এড়িয়ে চুপি চুপি স্বয়ং ভগবানকে দেখতে যাবার সাধ্য আছে কোন মেয়ে বৌয়ের? ওর দেহে কোন খুঁত নেই। ওর অসুখটা মানসিক।

সুদর্শনাও এই কথা বলেছিল—জগদীশ বিশ্বাস করতে পারে নি। ললিতার মধ্যে এরকম একটা মানসিক রোগ বাসা বেঁধে আছে, নিজের সুস্থ সবল নিখুঁত দেহটার একটা কাল্পনিক খুঁত

আছে বিশ্বাস করে স্বামীর ভয়ে দিশেহারা হবার মত মানসিক রোগ—এখনও সেটা বিশ্বাস হতে চায় না।

সে ধীরে ধীরে বলে, সাধারণ অবস্থায় রোগটার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না ?

ঃ না। আমি আসব জানলে সুরু হয়, ক্রমে ক্রমে বাড়ী আসবার পর দু'চার দিন থাকে—তারপর মিলিয়ে যায়। বাপের বাড়ী যদি পালিয়ে যায়—আমি আসবার দু'তিন দিনের মধ্যেই যায়। ওই পিরিয়ডটা কেটে গেলে সব ঠিক হয়ে যায়।

ঃ তোমার কাছে রাখ না কেন ?

ঃ আমার সুবিধে হয় না, তাই।

জগদীশ গম্ভীর হয়ে খানিক ভাবে। ধীরে ধীরে বলে, মানসিক রোগটা যখন খুব চড়া সেই অবস্থায় তা হলে ললিতা সেদিন রাত্রে এসেছিল ? তবু আমি ধরতে পারি নি ?

আলোক সহজভাবেই বলে, মানসিক রোগ বলে ধরবার চেষ্টা করেন নি, তাই পারেন নি। চেষ্টা করলে আপনিও পারতেন। আলোক আরেকটা সিগার বার করে ধীরে সুস্থে ধরায়। সিগারটা ভাল করে ধরিয়ে জোরে টেনে একরাশি ধোঁয়া ছাড়ে।

ঃ খানিক আগে খোঁচা দিচ্ছিলেন, বাবার টাকা আছে, বাবার খাতিরে তাই বাধ্য হয়ে আমাকে আসতে হয়েছে। খাতিরটা বাবার—সে তো আপনিও জানেন, আমিও জানি। তবে কিনা আপনার জানাটা একটু বাঁকারকম হয়ে গেছে। আপনি ভেবেছেন, বাপের অনেক টাকা আছে, বাপ মরলে ভাগ পাব,

তাই বাপের হুকুমে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! আপনার কি জানা আছে, ভাইবোনদের অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছি বাবার টাকাপয়সা বিষয়-সম্পত্তির অংশ আমি দাবী করব না?

: প্রতাপ জানে?

: জানেন বৈকি। জেনেই তো চটে আছেন আমার ওপর। যা ইনকাম হয় তা দিয়ে কি করব ভেবে পাই না ভাইদের সঙ্গে খ্যাঁচাখেঁচি করে কি হবে? আমি তাই জানিয়ে দিলাম, আমি ভাগ চাই না, বাবার যা কিছু আছে ভাইরা ভাগ করে নেবে। তারপরেই বাবার কি রাগ! তর্জন গর্জন করে আমায় শাসাতে লাগলেন, ত্যাজ্যপুত্র করবেন। কি করি, বুড়ো বাপকে তো আর—

জগদীশ হাত বাড়িয়ে দিতেই আলোকও হাত বাড়ায়—ঘনিষ্ঠ রকম করমর্দন হয় দু'জনের মধ্যে।

তারপর কয়েকদিন জগদীশ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে থাকে—কারো সঙ্গে দেখা করে না। বলে, রত্নাকর, আমি কদিন ভাবব। নেশার জন্য কি সেদিন রাত্রে ললিতাকে দেখেও ব্যাপার বুঝতে পারি নি?

একাদশ অধ্যায়

এত হিংসা কেন জলধির ?

এতকাল পরে কেন এমন ভাবে উথলে উঠল জগদীশের উপর তার অন্ধ ক্রোধ আর বিদ্বেষ ?

চিত্রার জন্য জগদীশের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা ছিল অত্যন্ত মার্জিত। চিত্রা তার মনের কথা জানাবার পর সে বিবাগীও হয় নি, রাগে দিশেও হারায় নি।

শুধু একটু সংযত করে নিয়েছিল চিত্রার সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, একটু দূরত্ব এনেছিল জগদীশের সঙ্গে পরিচয় মেনে নেওয়ার ভদ্রতা রক্ষায়।

জগদীশের জন্যই শোচনীয় দুর্ঘটনায় চিত্রার মরণ ঘটেছে জেনেও হিংসায় উন্মাদ হয়ে আঘাত হানতে চায় নি।

জগদীশের ভয়াবহ আত্মনিগ্রহের খবর জেনে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার সাধটা কি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তার কাছে ?

শুধু কৌতুহলের বশে জগদীশকে দেখতে এসে তার কল্পনাতীত রূপান্তর আর মানুষের কাছে সম্মান দেখে, তার হৃদয় মন শান্ত হয়েছে দেখে, ছোটলোক ভদ্রলোক মানুষের একটা বিরাট

অংশ তাকে আপন করে নিয়েছে দেখে—এতকাল পরে আবার কি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল হিংসার আগুন ?

চিত্রাকে যে একরকম হত্যা করেছে সে প্রাণান্তকর প্রায়শ্চিত্ত চালিয়ে যাক—তাকে চিত্রার হত্যাকারী ধরেও সমস্ত ব্যাপারটার জন্য আপশোষ করার উদারতা জলধির আছে।

কিন্তু ওভাবে প্রায়শ্চিত্ত চালিয়ে যাবার জন্যই মানুষের কাছে সে প্রায় মহাপুরুষ হয়ে উঠবে, জীবনের সঙ্গে নিবিড়তর যোগাযোগ ফিরে পেয়ে শান্তি পাবে—এটা সহ্য করা কি সম্ভব নয় জলধির পক্ষে ?

তিনমাস পরে তাই সে আবার তোড়জোড় বেঁধে ফিরে আসে আঘাত দিয়ে জগদীশকে চুরমার করে ফেলতে ?

উচ্চপদের সম্মান, ক্ষমতা, দায়িত্ব, শান্ত স্বামীভক্তিপরায়না শিক্ষিতা রূপসী স্ত্রী—সব যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে !

জগদীশকে আঘাত করা চাই ! চিত্রার মরণকে অতিক্রম করে জীবনের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে বলে ওকে জব্দ করা চাই, ধ্বংস করে দেওয়া চাই।

নতুবা জীবন বৃথা।

আদিবাসীদের এলোমেলো বিক্ষোভের আগুন চাপা পড়ে ধিকি ধিকি জ্বলছিল। এখানে ওখানে সীমাবদ্ধ অঞ্চলে হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ঝিমিয়ে যাচ্ছিল।

এমন কিছু ব্যাপার নয় যে একটু বিব্রত হবার বদলে কর্তাদের সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে হবে।

জলধিই নাকি ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে অদূর ভবিষ্যতের সাংঘাতিক পরিস্থিতির কার্য্য-কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে উঁচুতলায় কর্তাদেরও ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

সে যখন এত জানে বোঝে, সে যখন ধরতে পেরেছে জগদীশের আশ্রম থেকে কি ভাবে আদিম রহস্যময় কৌশলে চারিদিকে বুনো জংলী মানুষগুলিকে ক্ষেপিয়ে তোলার আটঘাট বাঁধা গোপনে অভিযান চলছে,— তাকেই ভার দেওয়া যাক বিক্ষোভ ও অসন্তোষের নিবু নিবু আগুনটা একেবারে ছাই করে ঠাণ্ডা করে দিয়ে ফুৎকারে শূন্যে উড়িয়ে দেবার।

ক্রোধ আর বিমর্ষতা মেশানো মুখখানায় পাউডার পর্য্যন্ত ছোঁয়াতে ভুলে গিয়ে সুদর্শনা আসে।

জগদীশকে বলে, আপনি কিন্তু সাবধান থাকবেন।

রত্নাকরকে বলে, তুমি কিন্তু আরও বেশী সাবধান। তুমিই নাকি ওনার দক্ষিণ হস্ত। ওঁকে জেলে দিয়ে যদি কাজ চলে— তোমাকে ফাঁসি দিতে হবে।

জগদীশ হাসিমুখে বলে, দিক না ফাঁসি—আমাদের তুজনকেই দিক। মরবার জন্য কতকাল আমরা ছটফট করছি—বেচারা আমাদের তু'জনের এত ঝনঝাট!

সে হাল্কা সুরে ব্যাপারটার গুরুত্ব উড়িয়ে দিয়ে সুদর্শনাকে

ধাতস্থ করতে চায়, বোঝাতে চায় যে একজন পদস্থ ক্ষমতাবান লোকের প্রতিহিংসার পাগলামিতে ভয় করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া লক্ষ কোটি গুণ ভাল।

রত্নাকর কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষের মত সিধে হয়ে যায়, প্রায় আর্তস্বরে আপশোষের আওয়াজে বলে, ইস্! এই সোজা কথাটা খেয়াল হয় নি আমার! জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছি নিজের যন্ত্রনায়, পাগলের মত ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে, যারা বড় স্কেলে মানুষ খুন করে তাদের একটাকে মেরে ফাঁসিতে লটকাবার সহজ রাস্তাটা খেয়াল হল না।

অস্ফুট একটা আওয়াজ করে সুদর্শনা। মুখ তার ছাই বর্ণ হয়ে গেছে।

জগদীশ রত্নাকরকে বকুনি দিয়ে বলে, এমনিতেই সোনা ভয়ে ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে, ঢং করে কেন ওকে ভড়কে দিচ্ছিস রতন? যা খেয়াল হবার ছিল না তা খেয়াল হয় নি— সোনার কথা শুনে খেয়াল করে এরকম করতে হয়? বড় দরের একটা খুনেকে খুন করে ফাঁশির সুখ পাওয়ায় কথা ভাবছিস মনে করে ওর দম আটকে আসছে দেখতে পাচ্ছিস না? ঘুরে ঘুরে এত দেখে এত শিখে তোর এটুকু কাণ্ডজ্ঞান জন্মাল না রতন!

জগদীশের বকুনি খেয়ে রত্নাকর সুদর্শনাকে ধমকের সুরে বলে, আমি কি আজকের কথা বলছি? সেরকম মনের অবস্থা এখন আছে নাকি? আমি বলছিলাম আগেকার কথা, যখন

মরার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তুমি বড় ঝগড়াটে, বড় অস্থির। একজন একটা কথা বললেই লাফিয়ে ওঠো। একমিনিট ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে পার না, মানুষটার বলা শেষ হয়েছে কিনা, আরও কিছু বলবে কিনা—

ঃ চুপ কর তুমি।

তীক্ষ্ণ মেয়েলি কণ্ঠে ফেটে পড়া পুরুষালি গর্জন।

জগদীশ একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টায়।

সুদর্শনার ধমক মেনে নিয়েও রত্নাকর নির্বিকার ভাবেই চুপচাপ বসে থাকে। সুদর্শনা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে জগদীশের দিকে।

তাদের ব্যাপারে হয় তো কিছু বলতেও পারে জগদীশ!

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটার পর জগদীশ বলে, আজকাল আর কবিতা লেখোনা রত্নাকর? ঝোঁক কেটে গেছে?

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ রত্নাকরের কবিতার প্রসঙ্গ টেনে আনা!

রত্নাকর বলে, ঝোঁকটা কেটে গিয়েছিল। আজকাল আবার যেন মাঝে মাঝে তাগিদ বোধ করি।

বলে সে সুদর্শনার দিকে তাকায়। এতকাল তাদের পরিচয় হয়েছে, এতকাল তারা জগদীশের সামনে বসেও কত কথা বলেছে, তর্ক করেছে, ঝগড়া করেছে—সুদর্শনাকে জগদীশ কখনো লজ্জা পেতে ছাখে নি। আজ তার মুখ লাল হয়ে যেতে দেখে জগদীশ একটু হাসে।

বলে, তোমাদের একটা কথা বলব, আমার বিনয় ভেবো না। আমিও সংসার ছেড়েছিলাম, রতনও ছেড়েছিল। ওটা ষ্টার্টিং পয়েন্ট ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে রতন অনেক নতুন চিন্তা আর অভিজ্ঞতার খোরাক পেয়েছে, আমি পেয়েছি সামান্যই।

রত্নাকর বলে, কি যে বল তুমি দাদা! তোমার সঙ্গে আমার তুলনা!

সুদর্শনা বলে, আপনি সত্যি বিনয় করে এটা বললেন—কিম্বা তামাসা করলেন!

জগদীশ বলে, না না, কথাটা সত্যি। এটা বুঝবার পরেই অনেক ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। বনে গিয়ে হাজার বছর চিন্তা করেও কেউ জ্ঞান বাড়াতে পারে না। আমিও পারি নি।

দু'জনে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

ঃ সংসার ছাড়ার সময় হয় তো রতনের চেয়ে আমার জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা বেশী ছিল, এখনো হয় তো রতন চিন্তার ওজনের হিসাবে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না—আমি সেকথা বলছি না। আমি বলছি নতুন চিন্তার কথা, জ্ঞান বাড়ার কথা। এখানে পালিয়ে আসার পর আমি কতটুকু নতুন চিন্তা পেয়েছি, কতটুকু জ্ঞান বেড়েছে? এতকাল একা একা দিনরাত ভেবে ভেবে আমি কি করেছি? আগে সঞ্চয় করা এলোমেলো চিন্তাগুলি শুধু ঝেড়ে ফুঁকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছি, মিলিয়ে নিয়েছি, যোগ বিয়োগ করে

কি দাঁড়ায় বার করেছি। তাছাড়া উপায় ছিল না মানুষকে ছেড়ে জংগলে এসে একলা হওয়া মানেই মনের ভাঁড়ারে ঢুকে ভেতর থেকে খিল এঁটে দেওয়া—ভাঁড়ারে যা ছিল তাই নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করা। আনকোরা নতুন চিন্তা আসবে কোথা থেকে, জ্ঞান বাড়বে কি করে? ভবঘুরে হয়েও রতন থেকেছে মানুষের মধ্যে, নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছে, নতুন চিন্তা মনের ভাঁড়ারে তুলেছে।

সুদর্শনা প্রায় কাতরভাবে বলে, তবে কি বলছেন আপনার সাধনা নিষ্ফল হয়েছে, নতুন কিছুই পান নি?

জগদীশ বলে, নতুন কিছু না পেলেও জংগলে আসা নিষ্ফল হয়েছে বলব না। এরকম একলা হয়ে দিন না কাটালে এলোমেলো খেই হারানো চিন্তার যে স্তূপটা জমেছিল সেটা ঘাঁটা হত না, যাচাই করে করে জঞ্জাল সাফ করা হত না, মিলিয়ে জোড়া দিয়ে আসল ভাবনাগুলি স্পষ্ট করা যেত না। এদিক দিয়ে বনে আসা নিষ্ফল হয়নি তবে আত্ম-চিন্তার সুযোগ মিলেছে।

জগদীশ একটু হাসে।

ঃ আগে বুঝতাম না তোমরা কেন আমার কথা শুনে খুশি হও—রতন আমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছে। আত্মচিন্তাও সাধনা বৈকি, চিন্তার জট ছাড়ানো কি সহজ ব্যাপার! নতুন চিন্তা না জুটুক, চিন্তার জট ছাড়িয়েছি। এই সাধনাকে তোমরা সম্মান কর। তোমরা এলোমেলো চিন্তায় হাবুডুবু খাও, আমি চট করে আসল কথাটা ধরিয়ে দিতে পারি।

রত্নাকর সোৎসাহে বলে, দাদা, বলিনি তোমায়, সংসার কাউকে ছাড়ে না, নিজের দরকারে ছুটি দেয়! হাড়ে হাড়ে এটা আমি টের পেয়েছি। সংসার বলে, তুমি পাগলাটে, মানিয়ে চলতে পারছ না—যাও, খুশিমত মন্দির থেকে আঁস্তাকুড় ঘাঁটবে যাও, খুশিমত চিন্তা করবে যাও, তোমার ছুটি মঞ্জুর। আমরাও জানতে বুঝতে চাই—কিন্তু আমাদের সময় কই, সুযোগ কই? যখন কিছু জানতে বুঝতে পারবে, আমাদের জানিয়ে বুঝিয়ে দিও!

জগদীশ হাসিমুখে সায় দিয়ে বলে, এবার বুঝলি তো আমার চেয়ে নতুন চিন্তা তুই বাড়িয়েছিস ঢের বেশী?

ঃ এলোমেলো নতুন চিন্তা নতুন অভিজ্ঞতার পাহাড় দিয়ে কি হয়?

ঃ শুধু জমানো চিন্তার জট ছাড়িয়ে নিলেই বা কি হয়?

সুদর্শনা ঠিক ধরতে পারছে না বুঝে জগদীশ বলে, চিন্তার জট খুললাম—তারপর? থেমে তো গেলাম সেইখানে। আমিও থেমে গিয়ে পাগল হতে বসেছিলাম—তোমরা এসে পাকড়াও না করলে নির্জনে আপন মনে আত্মচিন্তার শেষ কি দাঁড়াত কে জানে? তোমরা এলে, নতুন চিন্তা এল, তবেই না আরেকটু বেশী বুঝবার প্রক্রিয়া আবার চালু হল! জানাটা আলো জ্বালিয়ে রাখার মত—জ্বেলে যেতে হবে, আলো নেভালেই অন্ধকার।

জগদীশ জোর দিয়ে বলে, নাঃ, আত্মচিন্তার জন্য বনে এসে

লাভ নেই—ওটা ভালভাবে হয় না। মানুষের মধ্যে থেকে এটা চালিয়ে গেলে আরও কত জানতে পারতাম।

জগদীশ হাসে।—আমি অবশ্য আত্মচিন্তা করতে আসি নি, এসেছিলাম সুস্থ হতে। সুস্থই বা কই হলাম? তোমরা এসে বরং খানিকটা সুস্থ করেছ।

বিদায় নিতে উঠে দাঁড়িয়ে সুদর্শনার খেয়াল হয়, যে বিষয়ে সাবধান করে দেওয়ার জন্য সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে সেই বিষয়টাই চাপা পড়ে গেছে।

এমনভাবে মানুষকে ভুলিয়ে দিতে পারে জগদীশ। জলধির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জগদীশ প্রায় কিছুই বলে নি।

প্রশ্ন করতেই মুখ একটু বিষন্ন হয়ে যায়। ভয় ভাবনা হয়নি জগদীশের, মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

ঃ ওকথাই ভাবছি মেয়ে। সবজান্তা ভাবো আমাকে—ওর এই বিকারের মানে বুঝতে পারছি না। ওর রাগের কারণ, হিংসার কারণ বুঝতে পারছি—কিন্তু এমনভাবে মাথায় চড়ে যাবে কেন? স্বার্থবুদ্ধি বিচারবুদ্ধি তো কম নয় মানুষটার, কাণ্ড-জ্ঞানের অভাব নেই। আমাকে ঘায়েল করার সাধ জাগলেও নিজের বিপদের কথা ভাবছে না? চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে কত লোক ক্ষেপে যাবে—ওর চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবেই। কোন বিকার কোথায় চড়লে এভাবে সমস্ত বিচার তুচ্ছ হয়ে যায় ধরতে পারছি না।

রত্নাকর বলে, আগের জেলাসিটাই হয় তো—

জগদীশ মাথা নাড়ে।—জেলাসি তোমার কাছে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তুমি জেনে রেখেছ, জেলাসি মানুষকে দিয়ে সব করাতে পারে—হঠাৎ থেমে গিয়ে জগদীশ বলে, পরে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব, কেমন ?

রত্নাকর সুদর্শনার দিকে চেয়ে বলে, এখুনি বল না দাদা—পরে কেন ? তোমার সোনাকে আমার কীর্তির কথা জানাতে কি বাকি রেখেছি ? তবে আর কি শিখলাম তোমার কাছে ! অন্যকে বলি না বলি এসে যায় না—ওর কাছে গোপন করতে পারি সেসব কথা !

জগদীশ খুশি হয়ে বলে, আবার দেখলি তো, আমি সবজান্তা নই, ভুল করছিলাম ? সোনাকে সব যদি বলেই থাকিস, তবে তো তোদের চরম বোঝাপড়া হয়ে গেছে ! যতই ঝগড়া করিস, তোদের মনের মিল কে ঠেকায় ? আর আমি তোকে বকব না রতন !

রত্নাকর হেসে বলে, না না, মাঝে মাঝে বোকো—নইলে জমবে না। কিন্তু চাপা জেলাসি হঠাৎ জ্বলে উঠে আমার মত জলধির মাথা খারাপ করে দিয়েছে, এটা ঠিক নয় ?

ঃ না, শুধু জেলাসি অতটা চড়ে না, এরকম বিকার এনে দেয় না। জেলাসি হিংসা নয়, ওতে লড়াই করার জিদ থাকে, আরেক-জনকে হার মানিয়ে হটিয়ে দিয়ে জয়ী হবার ঝোঁক থাকে। জেলাসি খারাপ নয়, অনিয়ম নয়। জেলাসি ছাড়া প্রেম জমে না। প্রেম না জমলে জীবনের ধারা চালু রাখার ঝনঝাট

পোয়াতে ক'জন রাজী হবে? অন্য বিকার থাকলে সেটাই জেলাসির ঝাঁঝে চড়ে গিয়ে মানুষকে উন্মাদ করে দেয়।

রত্নাকর আরও উৎসাহিত হয়ে বলে, কথাটা তো ঠিক বলেছ মনে হচ্ছে! আরেকটা নতুন পাঠ তো শিখালে! হুঁ, ঠিক কথা, আরও কত জ্বালায় যে তখন জ্বলছিলাম, কতভাবে পাগল হয়ে উঠেছিলাম খেয়াল করিনি তো! আয়ও অনেক কিছু ছিল, কদিন আগে মা মরে গিয়েছিল—বিনা চিকিৎসায়, বিনা যত্নে।

হঠাৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে যায় জগদীশ। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। মুখের ভাব অন্যরকম হয়ে যায়। এতক্ষণ বসে বসে কথা বলছিল, এবার উঠে এসে তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

ঃ এবারে বুঝেছি। তুই আমাকে আবার সূত্র ধরিয়ে দিলি রতন! জলধি একা এসেছে, না?

সুদর্শনা বলে, একাই এসেছেন বলা যায়, শুধু মেয়েটাকে সঙ্গে এনেছেন। ওর একটি ছেলে, একটি মেয়ে, ছেলেটিকে নিয়ে ওর স্ত্রী ভিন্ন থাকে—

ঃ বুঝেছি—রতন ধরিয়ে দিতেই অনুমান করেছি। খুব সুন্দরী, একটু সেকেলে বৌ না?

সুদর্শনা চমৎকৃতা হয়ে বলে, কি করে জানলেন আপনি?

ঃ এটা জানা কঠিন কি। আমাকে উপলক্ষ করে চিত্রার শোকটা বিকার হয়ে মাথায় চড়ে যাবার কারণ থাকবে তো। ওর বেলা কারণটা থাকবে ওর সংসারিক জীবনেই।

কয়েক মুহূর্ত জগদীশ গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে নিথর নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর আবার একটা নিশ্বাস ফেলে, ঠিক যেন মেয়ে জামাইকে বিদায় দিচ্ছে এমনি স্নেহের সুরে বলে, আচ্ছা, এবার তোমরা এসো, রাত হয়ে গেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

দিন দিন অশান্তি বাড়ে। অস্বস্তি তীব্র হয়।

এত ভয় ভক্তি বিশ্বাস ভালবাসার প্রতিদানে কি সে দিচ্ছে মানুষকে প্রতিদান?

কতগুলি ছাঁকা কথা। আর ফাঁকা উপদেশ।

যদি সত্যও হয় রত্নাকরের কথা, একটি মেয়ের পার্থিব প্রেমকে উপলক্ষ করে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক চিন্তা ও অভিজ্ঞতা মন্থন করতে করতে সে যদি সন্ধান পেয়ে গিয়েও থাকে, অমৃতের, জর্জরিত উদভ্রান্ত মানুষের কাজে লাগায় যদি মূল্যবান হয়ে উঠে থাকে তার মুখের কথা—সেটাও তো শেষ কথা নয়।

সে তো মনে মনে জানে ভক্তদের প্রশ্রয় দেবার আরেকটা কারণ—তারই অতি বাস্তব প্রয়োজনের কারণ।

ওরা শুধু ভক্তি করে না, পয়সাও দেয়। নেশা করতে মোটারকম পয়সা লাগে।

সে অবশ্য ফেলে ছড়িয়ে রেখে এসেছে অনেক টাকা, কিন্তু সে তো নগদ টাকা নয়। কিছু অংশ উদ্ধার করতেই অনেক হাঙ্গামা পোয়ানো দরকার।

নেশার খরচের চেয়ে ঢের বেশী টাকা আসছে প্রণামীতে।

সে চায় না।

কিন্তু সকলে দেয়। এবং সে জানে যে ওরা পয়সা দেবে। ওরা প্রণামী দেবে জানে বলেই এমন নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে সে মহা-সমারোহে নেশার পাল্লা চালিয়ে যেতে পারছে।

আবার এটাও তো সত্য নয় যে শুধু প্রণামীর প্রয়োজনেই সে ভক্তদের বরদাস্ত করে এসেছে প্রথম থেকে।

ওরাও তো তাকে কম খাটিয়ে নেয় না।

কম ভাবায় না। কম বকায় না।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা তবে কি?

এ প্রশ্ন আর শুধু প্রশ্ন থাকে না। কুল-কিনারা পেতে শুধু ভেবেই কুলোনো যায় না। একটা যন্ত্রণায় দাঁড়িয়ে যায়।

দিন দিন বেড়ে চলে সেই যন্ত্রণা-বোধ।

অস্থিরতা, বদমেজাজ, অন্যমনস্কতা, কথা বলার মধ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র তীক্ষ্ণ ও গভীর ব্যাকুলতা, কথা বলতে বলতে হঠাৎ নির্ব্বাক নিশ্চল সমাহিত হয়ে যাওয়া—এরকম অনেক ধরণের লক্ষণের মধ্যে ভক্তদের কাছে প্রকাশ পায় যে কোন একটা বিষমরকম প্রক্রিয়া চলছে জগদীশের মধ্যে।

কেন ঘটছে আর কি ঘটছে তারা বোঝে না।

অনেকদিন প্রাণপণে সংযম রক্ষা করে সুদর্শনা সকলের সামনে ধমক খাবে জেনেও জিজ্ঞাসা না করে পারে না: আপনার শরীরটা কি ভাল যাচ্ছে না?

কি চিন্তায় বিভোর হয়েছিল জগদীশ সেই জানে, রেগে উঠে ধমক দেওয়ার বদলে মেঘ কেটে গিয়ে এক ঝলক রোদ ছড়িয়ে পড়ার মত হঠাৎ তার মুখে হাসি ফোটায় সকলে পরম স্বস্তি বোধ করে।

ললিতাও সাহস করে বলে বসে, আমরা বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। সাধনার কোন নতুন স্তরে উঠবার সময় কি—?

সমস্ত মুখ দিয়ে প্রশান্ত হাসি হাসে জগদীশ। কপালের চামড়ার দুটি কুঞ্চিত রেখায় পর্য্যন্ত যেন হাসি ঝলক মারে।

পরম স্বস্তি আর পরম আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে সকলের মন। উৎসুক হয়ে ওঠে।

এতগুলি মন আর সব কিছু ভুলে গিয়ে মনোযোগ দেয় জগদীশে।

না জানি জগদীশ কি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কথা বলবে, শুনতে শুনতে উত্তেজিত জর্জরিত দেহমন রোমাঞ্চিত হতে হতে কাটিয়ে উঠবে দুঃখ-বেদনা, হীনতা-দীনতা-বোধের অভ্যস্ত বাঁধন, সুমহান অনুভূতির আনন্দ সাগরে সাঁতার কাটার সুযোগ মিলবে।

যতক্ষণের জন্যই হোক!

জগদীশ মুখ খোলে।

ঃ সহরের ঘরে ঘরে বিদ্যুতে আলো জ্বালায়, সহরে আলো জ্বালা কত সহজ। সুইচটা টিপতেই ঘর আলো হয়ে যায়। সহরে একদিন সন্ধ্যা নেমেছে। নামকরা একজন বড় অধ্যাপক দশটা ক্লাসে হিট, লাইট, ইলেকট্রিসিটি বাখ্যা

করে করে বাড়ী ফিরে নিজের বই-গাদা-করা ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইলেন গালে হাত দিয়ে। ঘর অন্ধকার। এখন কি করা যায়?

সুদর্শনা আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে বলে, আমি বুঝেছি আপনি কি বলবেন!

জগদীশ হাসিমুখেই মাথা নাড়ে, তুমি ভূমিকাটুকু বুঝেছ—আসল কথা বোঝনি। আসল কথাটা তুমিই আমায় বুঝিয়েছ। না জেনে না বুঝে মায়ের স্নেহে মেয়ের ভক্তিতে ব্যাকুল হয়ে একটা প্রশ্ন করে বুঝিয়ে দিয়েছ।

খুব বড় একজন ডাক্তারের আজ এই আসরে প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল।

প্রতাপই টেনে এনেছিল তাকে।

মাঝে মাঝে মৃত্যুভয় দেখিয়ে কয়েকদিন ওষুধপত্র খাইয়ে নিয়মে চালিয়ে প্রতাপকে মরণ ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে বেঁচে থাকতে সে সাহায্য করে।

ডাক্তার সেন হেসে বলে, মায়েরা আর মেয়েরাই বুঝি সাধককে প্রেরণা দেন? বাপেরা আর ছেলেরা কোন কাজে লাগে না?

গম্ভীর হয়ে যায় জগদীশের মুখ। বলে, অন্য কাজে লাগে—সাধনার কাজে লাগে না।

ঃ কেন?

ঃ বাপ আর ছেলে শুধু যাচাই করে—আদায় করে। তাদের

শুধু ছাঁকা বিচার, ছাঁকা বিবেচনা—দায়-দায়িত্ব কর্তব্য-কর্তালি ভাগাভাগির সম্পর্ক। ছেলে বিয়োবার সাধ্য নেই পুরুষের, তাই বাধ্য হয়ে মেয়েদের শুধু মা হবার দায়টা দিয়েছে। একবার মা হবার বছরখানেকের সাধনা কি ব্যাপার তুমি ডাক্তার হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনেও অনেক কিছু জানো না ডাক্তার! নারীপুরুষে মিলন হল, ডিম্বকোষে প্রাণের পত্তন হল—

ছেলেমানুষী দুষ্টামি ভরা হাসি মুখে ফুটিয়ে রেখে খানিকক্ষণ সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে সে সশব্দে হেসে ওঠে।

ঃ আরে না না, ভয় নেই। অশ্লীল কথা বলব না। অত বোকা আমি নই। আমি কি এটা মেডিকেল কলেজের মড়া-কাটা ঘর বানিয়েছি যে কথার ছুরিতে মেয়ে পুরুষের দেহ কেটে কেটে তোমাদের দেহ চেনাব? তোমরাও এক একটা দেহের মালিক আমি ভুলে গেছি ভেবো না। দেহের ঝনঝাট নিয়ে অনেকবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে প্রণামী দিয়ে ধন্না দিয়েছ তাও আমি জানি। তোমাদের বলিনি বুঝি আমি ডাক্তার হতে বিলাত গিয়েছিলাম?

মেয়েদের কে একজন বলে, ওমা! তাতো জানতাম না! পুরুষদের একজন বলে, ডাক্তারি শিখতে বিলেত গিয়েছিলেন! জগদীশ গম্ভীর হওয়ামাত্র সকলে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

ঃ ছোটলোক চাষাভুষো একটা মুখ্যু মেয়ের মা হবার সাধনা

কি ব্যাপার আমরা হিসাবে ধরি না বুঝি না বলে, ডাক্তাররা খেয়াল করে না বলে আমাদের এই অবস্থা। ডাক্তার জেনেছে মেয়েরা নিছক মা হবার যন্ত্র—ভাঙা কুঁড়ে থেকে রাজার বাড়ীতে প্রত্যেক মা কি সাধনা চালায় সে খবর কি ডাক্তার রাখে? দু'চার বার ফরসেপ দিয়ে বাচ্চা টেনে বার করে দু'চারটা মা আর বাচ্চাকে বাঁচিয়ে ডাক্তার ভাবেন সৃষ্টি-রহস্য বুঝে গিয়েছি। আমাদের এই তিপ্পাই-এর মা সেদিন ভোরবেলা কতগুলি ফুল দিয়ে আমায় প্রণাম করল। দেখেই বুঝলাম একটা গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়। প্রণাম করে মাথা তুলতে তুলতে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করল। ঘরে ফিরে চেষ্টা করতেই—আমি এক ধমকে থামিয়ে দিলাম, বিছানায় শুইয়ে দিলাম। অনেক মা মেয়ে জুটে গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। এক ঘণ্টার মধ্যে চেঁচাতে চেঁচাতে কাল কুচকুচে একটা বাচ্চা প্রসব করল তাপ্পির মা।

ডাক্তার সেন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, এর মরালটা কি? আমরা কি জানি না স্বাভাবিক ডেলিভারিতে মায়েদের বিশেষ কষ্ট হয় না? বড় অপারেসন করার সময় রোগীকে অজ্ঞান করতে হয় কেন তার মানে বুঝি না? আমরা কি চোখকান বুজে যন্ত্রের মত ডাক্তারি চালাই? ফরসেপস দিয়ে দু'চারটে বাচ্চাকে টেনে বার করে এনে মা আর বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে দেওয়া কি আমাদের অপরাধ?

: অপরাধ? দু'চারটে মাকে আর বাচ্চাকে এভাবে বাঁচিয়ে

দিতে পার বলেই তো যারা আমায় সওয়া পাঁচ আনা প্রণামী দিয়ে কাজ সারতে চায় তারা তোমার দক্ষিণা দেয় বত্রিশ টাকা। কিন্তু দু'চারটে মা আর দু'চারটে বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্য কি তুমি বত্রিশ টাকা প্রণামীর গুরুঠাকুর হয়েছ? হাজার হাজার মা আর বাচ্চা মরুক বাঁচুক তোমার কিছু এসে যায় না?

ঃ এ তো নীতিকথা টেনে আনলেন! হাজার হাজার মা আর বাচ্চা বিনা চিকিৎসায় মরলে আমারও এসে যায় বৈকি, কিন্তু—

জগদীশ প্রশান্তভাবে বলে. আমিও তাই বলছি। এসে যায় কিন্তু একজন ডাক্তার কি করবে?—ও দায় রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রই ব্যবস্থা করতে পারে। ঠিক কথা। আমি শুধু তোমার এসে যাওয়ার কথাই বলছি। এসে যায়—কিন্তু তোমার একার কিছু করার সাধ্য নেই। দরিদ্র মূর্খের দেশ বলে তো পেশাটা তুমি দাতব্য করতে পার না—দু'চারজন করলেও ক'টা মা আর বাচ্চার মরণ ঠেকাবে। কিন্তু এটাই কি সব কথা? এসেই যদি যায়—শুধু ওইটুকু বুঝে শেষ হয়?

সকলে প্রতীক্ষা করে।

জগদীশ গলা চড়িয়ে বলে, না, ওইটুকু বুঝে শেষ হয় না। সত্যিই যদি এসে যায়, আরও অনেক কিছু না বুঝে চলে না। দারিদ্র্য আর অশিক্ষার দেশ কেন বুঝতে হয়—বুঝতে হয় কারা কিভাবে দেশকে এ অবস্থায় রেখেছে। দেশের লোকের বাঁচার রকম হালচাল না বুঝে আবার ওসব বোঝা যায় না। দেশের

লোকের দেহমনের ধাত জানা থাকলে তোমরা কি বিজ্ঞান শিখে এমন অজ্ঞানের মত প্রয়োগ করতে ডাক্তার? তিপ্পাই-এর মার বেলা গোলমাল হলে, ফি দিয়ে তোমায় ডেকে পাঠালে তুমি কি বিবেচনা করতে যে ফরসেপ দেখেই ওর মা হয়ে বাঁচার সাধ ফুরিয়ে যাবে, টেনে বার করা বাচ্চাটাকে নিজেই হয় তো প্রপাতে গিয়ে বিসর্জন দিয়ে আসবে?

আসর থম থম করে।

জগদীশ হেসে বলে, পদ্ধতিটা বৈজ্ঞানিক হলেই কি হয়? প্রয়োগটাও বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই। তাই বলছিলাম, হাজার হাজার মা আর বাচ্চা মরে বলে মনে যদিই বা একটু বেদনা বোধ কর—সেটাকে এসে যাওয়া বলে না ডাক্তার। এসে গেলে কোন অবস্থায় কিরকম ধরণের কোন মানুষটার উপর প্রয়োগ করছ এটা খেয়াল করে বিদ্যা প্রয়োগ করতে—দেশটাকে আর দেশের মানুষকে জানতে বুঝতে বাধ্য হতে। তবু যে তোমাদের বিদ্যার প্রয়োগ এতটা সফল হয় কেন জানো? অজ্ঞান মানুষ না জেনে না বুঝে তোমাদের ব্যবস্থা খানিক খানিক অদল বদল করে খাপ খাইয়ে নেয় বলে। এতে বিপদও ঘটে—ঠিকমত নির্দ্দেশ না মানার জন্য তোমরা রাগ কর, গাল দাও, আপশোষ কর। কিন্তু খেয়াল কর না যে শুধু রোগটা না ধরে মানুষটাকেও যদি ধরতে, তাকে বুঝে সে বুঝতে পারে মানতে পারে এমনভাবে নির্দ্দেশ দিতে, তাহলে গোলমাল হত না।

জগদীশ চুপ করলে ডাক্তার সেন ধীরে ধীরে বলে, এবার বুঝেছি আপনার কথাটা। ওসব খানিক খানিক বিচার করতে হয়—কিন্তু বিচারটা যে এতখানি গুরুতর ব্যাপার সেটা তলিয়ে বুঝিনি।

ভক্তেরা বিদায় হয়। থেকে যায় ললিতা ও সুদর্শনা। সুদর্শনা ক্ষোভের সঙ্গে বলে, আজেবাজে লোক এসে আপনাকে—

রত্নাকর বলে, আজেবাজে লোক মানে? তোমার মনের মত না হলেই বুঝি লোক আজেবাজে হয়ে যায়?

জগদীশ বলে, তোমরা একটু বাইরে গিয়ে তর্ক কর দিকি—মায়ের সঙ্গে আমি কথা সেরে নিই।

তারা বাইরে গেলে ললিতাকে বলে, তোমার খুঁত কি সেরে গেছে মা?

ঃ না। আপনি সারিয়ে না দিলে সারবে না।

ঃ সে রাত্রে পাগলের মত ছুটে এসেছিলে—আজ তো তোমায় বেশ তাজা দেখাচ্ছে? তোমার ভয় ভাবনা নেই, খুশির ভাব দেখছি। দু'তিন রাত একলা ঘরে খিল দিয়েছিলে, এখন তো তাও দাও না।

মুখখানা বিষণ্ণ করবার চেষ্টা করে ললিতা মৃদুস্বরে বলে, আপনি যে খানিকটা সারিয়ে দিয়েছেন? একেবারে সারেনি কিন্তু কি করব? একটু মানিয়ে তো চলতেই হবে, তাই সরে যাচ্ছি?

জগদীশ স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ধীর গলায় প্রশ্ন করে, সেদিন রাত্রে যে তুমি এসেছিলে, আমায় মাতাল মনে হয়েছিল?

ললিতা তাড়াতাড়ি বলে, মাতাল! না না, তাই কখনো মনে করতে পারি! আমিই তো ভয় পেয়ে গেলাম।

জগদীশ ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত রেখে স্নেহের সুরে বলে, তোমার অসুখ আমি একেবারে সারিয়ে দেব। তোমার জন্য আমি নিজের মস্ত একটা অসুখ ধরতে পেরেছি, তোমার অসুখ ভাল করে না দিয়ে পারি?

ললিতা জিজ্ঞাসা করে, আপনার কি অসুখ বাবা?

ঃ পরে শুনো—আগে মনটা স্থির করে কি ভাবে নিজের চিকিৎসা করব।

হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে জগদীশ বলে, তোমাকে সারাতে আমি কিন্তু কোন ক্রিয়া-ট্রিয়া করব না—সোজাসুজি তোমার চিকিৎসা করব না। আলোক তোমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে—ওই চিকিৎসায় তোমায় সারিয়ে দেবে। আমার যা করার করব, ডাক্তারকেও বলে দেব কি করতে হবে। তোমার অসুখের চিহ্নটুকু থাকবে না।

ললিতা খুশি হয়ে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

ভোর রাত্রে একদল পুলিশ নিয়ে বড় অফিসার দত্ত আশ্রম ও গাঁয়ে হানা দেয়—সঙ্গে আসে জলধি।

গাঁ ঘিরে রেখে তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী চালানো হয়।
রত্নাকরকে গ্রেপ্তার করা হয় সঙ্গে সঙ্গে।
তার নামে ওয়ারেন্ট ছিল।
দত্ত জগদীশকে বলে, এর আসল নাম জীবন, খুনী আসামী। শুনলাম আপনি জেনে শুনে ওকে আশ্রয় দিয়েছেন—
ঃ জেনে নয়, শুনে।
ঃ যাই হোক, ওকে আশ্রয় না দিলে হয় তো হঠাৎ এভাবে সার্চ করতে আসতে ইতস্তত করতাম। তেমন কোন পজিটিভ সূত্র আমরা পাই নি। আসল উদ্দেশ্য ওকে অ্যারেষ্ট করা—সার্চ ফর্মাল ব্যাপার।
জলধির দিকে চেয়ে জগদীশ বলে, নিজে হানা দিয়ে নিজের হাতে আমায় গুলি করে মারার সাধ মেটাতে পারলে না জলধি—এত চেষ্টা করেও আশে পাশে বুনোদের ক্ষেপিয়ে অজুহাত তৈরী করতে পারলে না? আমার হুকুমে ওরা উস্কানিতে সাড়া দেয়নি—নইলে হয় তো ক্ষেপত।
দত্ত আশ্চর্য্য হয়ে তার কথা শোনে।
জগদীশ আবার বলে, তবে ঘা তুমি সত্যই দিলে জলধি,—আমার ছোট ভাইকে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করলে!
জোড়া খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েও রত্নাকরের বিশেষ ভাবান্তর দেখা যায় নি, জগদীশের ক্ষোভ দেখে সে সশব্দে হেসে ওঠে।
ঃ পাগল হলে দাদা—কিসের ফাঁসি? ফাঁসি দেওয়া অমনি মুখের কথা! কত তদন্ত কত কাণ্ডকারখানা হল পুলিশ

চার্জশীট দিতে পারেনি। এই ভদ্দরলোকের কারসাজিতে আবার জড়ালেই ফাঁসি হয়ে যাবে? ছ্যাখো না কদিন লাগে তোমার ভাইটির ফিরে আসতে!

জগদীশ স্বস্তি বোধ করে বলে, তাই বলো! ওসব ঢুকে যাবার পরে তুই ভবঘুরে হয়েছিলি!

রত্নাকর হাসে, তবে কি? ফাঁসি যাবার সুযোগ পেলে ছাড়তাম নাকি? আমি নিজে পুলিশকে হেল্প করেছি—তবু প্রমাণ খাড়া করতে পারি নি। মরবে জেনে দু'জনে যদি পরামর্শ করে এমনভাবে মরে যে কেউ বিশ্বাস করবে না তাদের খুন করা হয়েছে, খুনীর মুখের কথা কেউ শোনে? বেশী জিদ করলে পাগল বলে ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা হয়।

দত্ত প্রশ্ন করে, নাম ভাঁড়িয়েছেন কেন?

: ভাঁড়াব না? খুনে বলে চাদ্দিকে নাম ছড়িয়ে ছেড়ে দেবেন, —ও-নাম নিয়ে আমি যাই কোথা!

: অনেকের কাছে বলেন কেন খুন করেছেন?

: খুন করেছি বলেই বলি। অনেকের কাছে নয়, দু'চারজনের কাছে।

জগদীশ জলধির দিকে চেয়ে বলে, বিকারটা সারিয়ে নাও না জলধি? চিকিৎসা করলেই তোমার মনের ব্যারাম সেরে যাবে। নিজেও সুখী হবে, তোমার স্ত্রীর জীবনটাও নষ্ট হবে না।

জলধি বলে, কি বকছেন পাগলের মত ? আমার মনের কোন রোগ নেই।

জগদীশ নিশ্বাস ফেলে বলে, তা বটে। তোমার মত রোগীরা যদি জানত নিজের রোগ আছে, তা হলে তো রোগটাই সেরে যেত !

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রতাপকে ডেকে জগদীশ বলে, একটা দায় নাও। একটা কাজের কাজ কর। আটচালাটা তুলে দিয়ে তুমিই আমায় এদিকে ঝুঁকিয়েছ। আটচালায় চলবে না। আমি এখানে মস্ত হাসপাতাল গড়ব—মনের রোগীর হাসপাতাল। পাগলের হাসপাতাল সহরেই আছে, এখানে করবো মানসিক রোগের হাসপাতাল।

প্রতাপ বলে, হাসপাতাল!

ঃ হাসপাতাল কথাটা পছন্দ না হয়—নাম দিও চিকিৎসাকেন্দ্র, আরোগ্য নিকেতন—কিম্বা শুধু সংশোধন!

প্রতাপ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ওটাই খাসা নাম হবে—সংশোধন! জগদীশ বলে, তোমার বিষয়বুদ্ধি পাকা—তুমি পারবে। এ্যাদ্দিন যারা বে-আইনী ভোগদখল করছে তাদের খাজনা সুদ ভাড়া এসব মাপ করেও শুধু জমি তালুক বাড়ী বেচেই লাখের মত ন্যায্য পাওনা হয়। হাজার পঞ্চাশ ষাটের মত লগ্নী করা আছে। লাখ দেড়েকের মত বীমা আছে—পাকা।

ঃ কদ্দিন প্রিমিয়াম বন্ধ?

ঃ যদ্দিন তোমাদের এখানে আছি! মা'র হাজার ত্রিশেক টাকার গয়না বন্ধক আছে, সুদটা নিয়ে একটু যদি মারামারি করতে পার প্রতাপ—

প্রতাপ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাঙ্কের সুদ না মহাজনের সুদ? মহাজনের সুদের হিসাবে দিয়ে থাকলে এ্যাদ্দিনে গয়নার দামের চার পাঁচ গুণ পাওনা হয়ে গেছে মহাজনদের।

জগদীশ হেসে বলে, ব্যাঙ্কেই বাঁধা আছে। বললাম না লগ্নীতে অনেক হাজার ছড়ানো আছে? বাবা ছিলেন জমিদার, আড়তদার মহাজন—বাবার ছেলে আমাকে তুমি এতই বোকা ভেবেছ যে মায়ের গয়না বাঁধা দিতে মহাজনের কাছে যাব! হঠাৎ বিপদে পড়ে দিশেহারা হয়ে টাকায় মাসে দু'পয়সা সুদ দিতে রাজী হয়ে কতলোক সুদও দিতে পারে না, গয়নাও ছাড়াতে পারে না,—এসব কি আমার অজানা প্রতাপ? ছেলেবেলা থেকে বাবা আমাকে এসব হিসাবনিকাশ বিচার-বুদ্ধি শেখাননি?

প্রতাপ গদগদ হয়ে বলে, সবদিকে সব হিসাব না জেনে বুঝেই কি তুমি দেবতা হয়েছ বাবা! মহাজন মাসে টাকায় দু'পয়সা সুদ নেয় তাও তোমার জানা!

খানিকক্ষণ এলোমেলো কথা চলে। জগদীশ নিজেই এলেমেলো কথার পালা সুরু করে। প্রতাপকে একটু ভাবতে দিতে হবে বৈকি, হিসাব-নিকাশ কষে দায় ঘাড়ে

নিয়ে লাভ কি হবে লোকসান কি হবে একটু সমঝে দেখার সুযোগ না দিলে চলবে কেন ?

ভক্তি করে বলেই তো বিপাকে ফেলা যায় না প্রতাপকে।

জগদীশ বুঝিয়ে বলে, দেড় দু'লাখ টাকার দায় চাপাচ্ছি —লাভের হিসাব ভুলে যাও প্রতাপ। লাভ তোমার হবে। আমার যত হাজার টাকা উদ্ধার করবে, হাজারে তোমার একশো বখরা।

মুখের গোমড়া ভাব কাটেনা প্রতাপের।

ঃ হাজারে একশো ?

ললিতা উঠে এসে প্রতাপের কানে কানে কি বলে সেটা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না জগদীশের।

—হাজারে একশো কি কম হল ? টেন পাসর্সেণ্ট ! ভাল কাজের জন্য টাকা তোলাচ্ছি, ভোগের জন্য নয়। রাজী হয়ে যাও, আপত্তি কোরো না।

প্রতাপ মরিয়া হয়ে বলে, যাক. হাজারে একশো পঁচিশ করে দাও, ছ্যাখো দায়টা আমি কেমন পালন করি !

ঃ বেশ তো, তাই নিও। দায় যে কঠিন আমি জানি। দেড়লাখ যদি আদায় করতে পার, হাজারে একশো পঁচিশ তো পাবেই, মোট হিসাবে দশহাজার বেশী পাবে।

গভীর রাত্রে ঘুম আসতে সুরু করার সময় রত্নাকর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, দায়টা আমায় দিলেই হত ?

: তুই পারবি না। তোর বিষয়বুদ্ধি নেই।

: ন্যায্য পাওনা তো তোমার? করতাম নয় মরতাম—তোমার ন্যায্য পাওনা আদায় করে আনতাম।

জগদীশ হাসে।—মরেও পারতিস না রে, এতকাল ঢিল দিয়ে পাওনা আদায় করা অত সহজ নয়। মরণ পণ করে লেগে গেলাম আর অন্যের খপ্পরে যাওয়া ন্যায্য পাওনা পেয়ে গেলাম, সংসারে অত ন্যায় খাটলে ভাবনা ছিল নাকি? তুই মরলে এ জগতে কার কি এসে যায়? এ জগতের কার সস্তা দায়টা তুই ঘাড়ে নিয়েছিস? তোর বাহাদুরী তো সব দায় এড়িয়ে চলা, আমার কাছে ধন্না দেওয়া!

পরদিন প্রতাপ প্রায় সপরিবারে হাজির হয়।

বলে, দায় নিলাম।

বিরক্ত জগদীশ কথা বলে না।

ফোকলা মুখে একগাল হেসে প্রতাপ বলে, না না সেজন্য আসিনি। বুঝিয়ে দিতে এলাম যে দায়টা সত্যি নিয়েছি। সংসারের সকলের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছি। বুঝিয়ে দিয়েছি—এ দায় যদি না উদ্ধার করতে পারে চুলোয় দেব ঘর সংসার!

: দায় নিয়ে তোমার কাজ নেই প্রতাপ!

প্রতাপ তো ছেলে মানুষ নয়! সে চুপ করে থাকে। প্রায় তার সমগ্র পরিবারটি একে একে জগদীশের পায়ে মাথা নত করে প্রণাম করে সরে যায়।

প্রতাপ ধীর গম্ভীরভাবে বলে, রাগের কারণটা বুঝেছি বাবা,

কিন্তু কি করব উপায় নেই। যে কাজ যত কম খরচে উদ্ধার করতে পারি—এটা একেবারে ধাত দাঁড়িয়ে গেছে। অন্যভাবে তো পারব না, ভেতরে জোর পাব না। তুমি আমার কিপ্‌টে-পানা সারিয়ে দিয়েছ, সত্যি দিয়েছ। সকলকে ভোগে বঞ্চিত করে টাকা জমানোর ব্যারামটা সারিয়ে দিয়েছ কিন্তু বিষয়-কর্ম চালাবার ধাতটা তো বদল করে দাও নি—অন্য কায়দায় পারব কেন?

জগদীশ এবার হাসিমুখে বলে, তুমি আমায় হার মানালে প্রতাপ। ঠিক কথা, তোমার কায়দায় তোমার বিষয়বুদ্ধি খাটিয়ে আমার টাকা উদ্ধার করতে পারবে বলেই তো তোমায় দিয়েছি। তুমি লাভটা বড় করে দেখছ ভেবে রাগ হয়েছিল।

প্রতাপ হেসে বলে, তোমার কাজ উদ্ধার করে দিয়ে সত্যি কি আর লাভ করব বাবা? অত বড় পাষণ্ড কি আর আমায় তুমি রেখেছ? আমি যা পাব সব তোমারই হাসপাতালের ফাণ্ডে জমা দেব।

সন্ধ্যাবেলা রত্নাকর বলে, প্রতাপ তোমার কেমন ভক্ত দাদা? তোমার টাকাকড়ি উদ্ধার করে দিয়ে লাভ মারতে চায়? হাজারে একশো লাভে খুশি নয়, তোমার সঙ্গে দরাদরি করে একশো পঁচিশ বাগিয়ে নিল!

ঃ তুই বুঝবি নে। বললাম না তোর বিষয়বুদ্ধি নেই। আমার টাকার ভাগ বসিয়ে প্রতাপ লাভ করবে না—সে সাহস ওর

নেই। প্রতাপ হিসাব করছে আমি অন্য দিকে অন্য ভাবে ওকে কত লাভ পাইয়ে দেব,—ছেলেমেয়েদের আনুগত্য পাইয়ে দেব, সম্মান পাইয়ে দেব। আমার টাকায় লাভ মারলে ভয়ানক পাপ হবে না ওর!

ঃ কমিশন আদায় করছে কেন তবে?

ঃ লোকসান ঠেকাতে। প্রতাপ কি আর নিজে ছুটোছুটি করবে টাকাপয়সা বিষয় সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য? কাজ করিয়ে নেবে অন্যকে দিয়ে, নিজে শুধু হাল ধরে থাকবে, চাল মারবে, কৌশল খাটাবে। তাতে তো খরচ আছে! তাই একটু মার্জিন রেখে হাজার করা পঁচিশ টাকা আব্দার ধরে আদায় করে নিয়েছে।

ঃ ধর যদি হিসেবের চেয়ে বেশী আদায় হয়? তোমরা দু'জনে হিসাবপত্র করে লাখ দেড়েকের আশা ছেড়ে দিয়েছ। যদি ওর একটা মোটা অংশ আদায় হয়? নাম তো তোমার কম ছড়ায় নি দাদা, প্রতাপ সেটা কাজে লাগাবেই। তোমার মত সাধুসন্ন্যাসী মহাপুরুষের টাকা মেরে দিয়েছে জানতে পারলে দশজনে কিরকম ছি ছি করবে, ভবিষ্যতে কিরকম মুস্কিলে পড়বে, এসব তো বলবেই। তাছাড়া, পাপের ভয়ও দেখাবে। অন্যের ঘাড় ভেঙ্গে হজম করা যায়—তোমার টাকা কি হজম হবে? তোমার কি সহজ ক্ষমতা? পারমিট ফারমিট যোগাড় করেও লাভের ভরা জাহাজ তোমার শাপেই হয়তো ভরাডুবি হয়ে যাবে মাঝ-দরিয়ায়!

জগদীশ সশব্দে হেসে ওঠে।

ঃ বারবার বোঝালাম না তোকে, তোরবিচার বুদ্ধি আছে, বিষয়-বুদ্ধি নেই। প্রথম যুক্তিটা বেশ খাড়া করলি, প্রতাপ আমার নাম নিয়ে কৌশল খাটাবে! কিন্তু আমি গোসা করে শাপ দিলে ভগবান ওদের লাভের জাহাজ মাঝ-দোরিয়ায় ডুবিয়ে দেবে —এ কৌশল প্রতাপ খাটাবে না। একথা বলেই তুই প্রমান দিলি তোর বিষয়বুদ্ধি নেই।

রত্নাকরকে কখনো রাগতে দ্যাখেনি জগদীশ। তার ভাবভঙ্গি কথাবার্ত্তা থেকেই টের পাওয়া যায় সে ভীষণ চটে গেছে!

জগদীশের পায়ের কাছে কয়েকবার মেঝেতে মাথা ঠোকে। যোগাসনে বসার মত মেরুদণ্ড সিধা করে বসে বুনো কার্পাসী চটের সার্টের তলাটা তুলে মুখ মোছে।

পৃথিবীর গায়ে জড়ানো মোটে মাইল পাঁচেকের মত যে বায়ুস্তর আছে তার সবটা এক নিশ্বাসে শুষে নেবার মত গভীর একটা নিশ্বাস ছাড়ে।

বলে বুঝিয়ে বলো দাদা। বাপ বলিনি, দাদা বলেছি তো! কি বললে ছোট ভাইটিকে বুঝিয়ে বলো।

জগদীশ স্নেহের দৃষ্টিতেই তার দিকে চেয়ে থাকে। তার মুখের হাসিখুশি ভাবের এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটে না।

রত্নাকর মরিয়া হয়ে বলে, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বিনে মাইনেয় আশ্রমের ম্যানেজার, হেড-ক্লার্ক, ষ্টোর-কিপার, ক্যাশিয়ার, গেটকিপার—সব পোষ্টে খাটিয়ে নিচ্ছ। আসল

কাজের বেলা আমায় বাদ দিয়ে প্রতাপকে খাতির করা কেন? আমি কি ভেসে এসেছি?

ঃ ভেসে আসিস নি? সাত আট বছর এদিক ওদিক ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেকিস নি? কি করে তোকে বোঝাব বল! তুই কি বুঝতে চাইছিস! সুদর্শনা উস্কে দিয়েছে, তুই আবদার ধরেছিস, জিদ করছিস।

রত্নাকর একটু নুয়ে যায়।

ঃ সত্যি সত্যি সর্ব্বজ্ঞ হয়ে গেছ নাকি?

ঃ সর্ব্বজ্ঞ হতে হয়? চোখের সামনে দেখছি না তোদের ব্যাপার-স্যাপার?

জগদীশ হাসে।

ঃ ছিলি ভবঘুরে, হয়েছিস আমার কুঁড়ে ঘর আর আটচালাটার দরোয়ান। দু'জনে একটা হেস্ত নেস্ত করে ফেলতে সাহস পাচ্ছিস না—কেবলি হিসেবনিকেশ ঝগড়া আর পরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছিস!

রত্নাকর খানিক চুপ করে থেকে সোজাসুজি অবুঝ আব্দারের সুরেই বলে, কাজটা সোজাসুজি আমায় দিলে দোষ কি হয়, সোজা করে বুঝিয়ে দাও না! লেখাপড়া শিখেছি, কবিতার বই লিখেছি, বোকা-হাবা তো নই!

জগদীশ এবার গম্ভীর হয়ে বলে, তবু তুই পারবি না। প্রতাপ যেখানে কায়দা করে পাঁচ কষে চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে কাজ আদায় করবে—তুই সেখানে সোজাসুজি

তেতে গিয়ে বলবি—কই গো, জগদীশবাবুর ন্যায্য পাওনাটা উগরে দাও, নইলে খুন করব! আটঘাট বেঁধে প্রতাপের আদায় করতে নামার রকম দেখেই সবাই টের পাবে—একেবারে ঘুঘু লোক, ওর সঙ্গে ইয়ার্কি চলবে না। একটা আপোষ করবে। জানিস না বুঝিস না, কোনদিন ছ্যাঁচড়ামির ধার ধারিস নি—এ কাজ কি তোকে দিয়ে হয় রে রতন?

রত্নাকর মুখ ভার করে চুপচাপ বসে থাকে।

জগদীশ হেসে বলে, ভাবিস কেন? এতবড় একটা মহাপুরুষের লেজ ধরেছিস, তোদের একটা গতি হবে না? প্রতাপ ওদিকে আমার টাকাপয়সা উদ্ধার করুক, তুই এদিকে আদায়পত্র বাড়া, চাঁদা তুলতে সুরু কর—

হাসিমুখে হাল্কা সুরে বললেও টের পাওয়া যায় জগদীশ তামাসা করছে না।

ঃ চাঁদা?

ঃ চাঁদা। একটা ফাণ্ড খুলে কোমর বেঁধে চাঁদা তুলতে লাগতে হবে। একটা সত্যিকারের আশ্রম করব—মানসিক রোগের চিকিৎসার আশ্রম। পাকা বাড়ী হবে, ডাক্তার থাকবে, নার্স থাকবে—

রত্নাকর পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে।

জগদীশ বলে, ভাবলাম কি জানিস? আমি যদি এলোমেলো-ভাবে কথা বলে ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে ভাঙ্গা মনে জোড়াতালি দিতে পেরে থাকি, তোর মত ডবল খুনে ভাবুক ভবঘুরের প্রাণের

জ্বালা জুড়িয়ে আবার সংসারী করতে পেরে থাকি,—দু'একজন ডাক্তারের সঙ্গে মিলেমিশে নিয়মমত চেষ্টা করলে কত বিগড়ানো মনকে শুধরে দিতে পারব!

রত্নাকর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, এইজন্য টাকাকড়ি উদ্ধারের সাধ জেগেছে! আমি ভাবছিলাম—

জগদীশ বলে, আমিও ভাবছিলাম তোরা কি ভাবছিস—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করিস না কেন! এদিকে জিজ্ঞাসার অন্ত নাই —হঠাৎ আমার দেড়লাখ দু'লাখ টাকার দরকার পড়ল কেন, কারো মনে সে প্রশ্ন জাগল না?

আজকাল প্রায় রোজই রত্নাকরের সঙ্গে সুদর্শনার তর্ক আর ঝগড়ায় খণ্ডযুদ্ধ বাধছিল।

অন্যেরা উপস্থিত থাকলে কোন বিষয়ে খানিকটা কথা কাটাকাটি হয়ে যায়, তার বেশী গড়ায় না। জগদীশ এবং আশ্রমের যারা ঘরোয়া লোক হয়ে গেছে তাদের সামনে তর্ক সুরু হলেই সেটা দাঁড়াচ্ছিল কথার যুদ্ধে।

হঠাৎ দেখা যায়, তর্ক তাদের বাধছে ঠিকমতই কিন্তু সেটা ঝগড়ায় পরিণত হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

আপোশে নয়—দু'জনে যেন মিলে মিশে তর্ক করে পরস্পরকে আরও ভাল করে বুঝবার প্রয়োজন।

জগদীশ বলে, ব্যাপার কিরে? হাসপাতালের টাকায় মোটা ভাগ বসাবার মতলব আঁটছিস নাকি? দেড় লাখ

ছ'লাখের ব্যাপারে নামছি, তোদের হিল্লে হবে বলেছি—অমনি বুঝি ঠাউরে নিয়েছিস রাজারাণীর হালে থাকার হিল্লে হল ?

রত্নাকর মুখ খুলতে যাবে, সুদর্শনা ধমক দিয়ে বলে, চুপ !

হেসে জগদীশকে বলে, যেমন ভাবেই বলুন, আমরা আর চটব না। আমরা বুঝে গিয়েছি। আমরা আপনাকে সাধু মনে করি ভাবেন বুঝি ? কোনদিন ভাবিনি। শুধু কথা বলতেন, তেমন যেন ভাল লাগত না। যেমন হোক কাজে নামছেন, আমরা অমনি মজা পেয়েছি। ছ'জনে কোমর বেঁধে খাটব, —কে কি করব পরামর্শ করছি কি না, তাই আর ঝগড়া হচ্ছে না।

জগদীশ হাত বাড়িয়ে সুদর্শনার গালটা টিপে দেয়।

ঃ এত উপদেশ না ঝেড়ে আরাম-বিলাস চাইবি না বললেই চুকে যেত।

গাল-টেপা হাতটাকে সরে যেতে না দিয়ে ছ'হাতে চেপে ধরে রেখে ছোট মেয়ের মতই ঠোঁট ফুলিয়ে সুদর্শনা বলে, আরাম-বিলাস চাইব না মানে ? নিশ্চয় চাইব। আরাম-বিলাসের ব্যবস্থা ছাড়া নিজেদের সভ্য মানুষ ভাবব কি করে ? শুধু রাজা-মহারাজারাই আরাম-বিলাস ভোগ করবে, আমরা ভেসে এসেছি ? তবে তোমার কাজ যদিন না উদ্ধার হয় তদ্দিন আমরা নেংটি পরে ইলুবীজ খেয়ে দিন কাটাতে রাজী আছি।

জগদীশ রত্নাকরের দিকে তাকায়। হাত তার বন্দী হয়ে আছে মেয়ের মত সুদর্শনার দুটি পেলব মেয়েলি হাতের মুঠোয়।

রত্নাকর বলে, সামলে দেব, কাজ হবে, ভেবো না। কতগুলি নিয়ম চালু করতে হবে। সে সব আমরা ঠিক করে নেব, তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকেও কিন্তু মানতে হবে আমাদের নিয়ম।

কিছু কিছু নিয়মও চালু হয়েছে রত্নাকর ও সুদর্শনার চেষ্টায়। আগে ছিল শুধু একটা নিয়ম—সন্ধ্যার সময় জগদীশ নেশা সুরু করলে জিরাই তাপ্পি রত্নাকরেরা ক'জন ছাড়া অন্য কারো জগদীশের কাছে যাওয়া ছিল বারণ।

এখন দুপুরে জগদীশের খাওয়ার পর (ভক্তেরা বলে ভোগ) দু'ঘণ্টা জগদীশের বিশ্রামের সময় নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আশ্রমের ঘরোয়া মানুষ ছাড়া কেউ কাছে যেতে পারবে না জগদীশের।

এখানে বাস করার প্রথম অনুমতি জুটেছিল রত্নাকরের। যখন খুশি আসার এবং জগদীশের কাছে যতক্ষণ খুশি বসার অধিকার জুটেছে সুদর্শনার।

অন্য ভক্ত অসময়ে এলে জগদীশ রেগে গিয়ে বলে, সারা সকাল বকবক করেছি, আরও বকাতে চাও? চারদিকে ঘুরে প্রকৃতির শোভা দর্শন কর না বাবু, তৃপ্তি পাবে। আমায় দর্শন করে এক ফোঁটাও পূণ্য হবে না।

রত্নাকর বলে, প্রতাপ ওদিকে টাকাগুলো উদ্ধার করে আনছে,

চাঁদাও উঠছে মন্দ নয়। প্রণামীর টাকা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে ?

ঃ না, আর বিলোব না। এলোমেলো ভিক্ষা দিয়ে কটা গরীবের দুঃখ দূর করব ? তার চেয়ে দশটা প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে, লোকের এত দারিদ্র্য কেন বুঝিয়ে দিলে, কিসে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য কমবে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলে ঢের বেশী কাজের কার্জ হবে !

কাজের কাজ !

কাজের কাজে জগদীশের মন ঝুঁকেছে !

কোথায় স্থাপন করা হবে জগদীশের আশ্রম—মানসিক ব্যাধির হাসপাতাল ? এখানে ? এই বনের ধারে বুনোদের গাঁয়ে ? না, আশ্রম হবে লোকালয়ে, সহরের কাছে।

সহরের কাছে শান্ত নির্জন স্থানে জমি কিনে যেদিন ভিত্তি-স্থাপনের উৎসব হল সেদিন সন্ধ্যায় ভক্তদের বুক ভয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে কি কাণ্ডটাই যে জগদীশ করলো !

নতুন কেনা জমিতে তিনটি কুঁড়ে তোলা হয়েছে—পরদিন জগদীশ বনের মায়া প্রপাতের মায়া কাটিয়ে বিদায় নিয়ে ওখানে চলে যাবে, জিরাই তাপ্পিরা কয়েকজন সঙ্গে যাবে।

কয়েকজন ভক্ত আজ রাত্রে এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছে। আগের দিন জগদীশ নেশা করেনি। মাঝরাত্রি পর্য্যন্ত ছটফট করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা একটা তন্দ্রার মধ্যে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিল।

রত্নাকর দ্বিধার সঙ্গে বলেছিল, এরকম হঠাৎ বন্ধ করলে দাদা?
ঃ হঠাৎ বন্ধ না করলে এসব বন্ধ করা যায়?
বিকাল থেকেই জগদীশের যেন কেমন কেমন ভাব। সন্ধ্যার পর হঠাৎ একসময়—সাপ! সাপ!—বলে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে ভয়ে দিশেহারার মত সে কাঁপতে আরম্ভ করে।
দেখা যায়, তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। তারপর স্বরু হয় তার আবোল-তাবোল কথা, এলোমেলো চীৎকার আর ছট-ফটানি। ঠিক জ্বর-বিকারের রোগীর মত করতে থাকে।
সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় মরণের আতঙ্কটা! আশে-পাশের ভক্তরাই নাকি তাকে খুন করার মতলব এঁটেছে—দা, কুড়াল, টাঙ্গি এসব এনেছে তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলার জন্য!
সুদর্শনা গায়ে হাত দিয়ে বলে, গা তো ঠাণ্ডা!
প্রতাপ বলে, ডাক্তার আনা উচিত।
প্রতাপের গাড়ী ডাক্তার আনতে সহরে ছুটে যায়, রত্নাকর জগদীশকে বলে, একটু খাবে? বিলাতী একটু খাও না।
জগদীশ কাতরভাবে বলে, না না, মরে যাব। কে যেন বোতলটার মধ্যে বড় বড় কাঁকড়া বিছে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমায় মারতে চায়!
ডাক্তার আসে। পরীক্ষা করে। বলে, ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্‌স। বেশী ড্রিঙ্ক করলে হয়, হঠাৎ ড্রিঙ্ক বন্ধ করলেও এরকম হয়।
পরদিন জগদীশ বলে, তোমরা কাজ কর্ম চালিয়ে যাও—আমি

কিছুদিনের জন্য ছুটি নিলাম। বিষ খাওয়া রোগটা সারিয়ে ফিরে আসব। এ এমন বিষ! খেলেও কাবু করে, মনের জোরে খাওয়া বন্ধ করলেও কাবু করে!

কোথায় যাবে জগদীশ?

ঃ হাসপাতালে যাব। মনের জোরের টোটকা চিকিৎসা বুঝি না আমি। ডাক্তার যা বলবে, যা করবে।

জগদীপ প্রশান্তভাবে হাসে।

ঃ সবাই প্রমাণ দেখলে তো, আমি যোগী নই, সিদ্ধপুরুষও নই। নইলে মদ ছাড়তে হাসপাতালে যেতে হয়!

ললিতা হাসিমুখে বলে, আমরা বুঝি জানি না ভেবেছেন বাবা? আমার অমন রোগটা সারিয়ে দিলেন, ইচ্ছা করলে ওসব আপনি ছাড়তে পারেন না! আসলে নিজের জন্য আপনি বিশেষ শক্তি খাটাবেন না—দশজনের মত চলবেন। আপনি আমাদের শেখাচ্ছেন।

সকলে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।